মজলিস

শ্রীজ্যোতির্ম্ময় ঘোষ

মজলিস

শ্রীজ্যোতির্ম্ময় ঘোষ

(ভাস্কর)

১৯৪১

ভূমিকা

আমার কয়েকটি লেখা একত্র করিয়া 'লেখা' এবং 'শুভশ্রী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল। আরও কয়েকটি লেখা প্রকাশিত হইল।

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

মজলিস—প্রথম বৈঠক	...	...	১
মজলিস—দ্বিতীয় বৈঠক	...	...	১৪
শ্লেট	...	...	৩৪
খোকা	...	...	৩৭
পান	...	...	৪১
উপকার	...	...	৪৬
আর্ট ও জুতা	...	...	৫৬
প্রাতর্ভ্রমণ	...	...	৬১
কনে	...	...	৭০
প্রাণ ও ডাঁটা	...	...	৮৭
মজলিস—তৃতীয় বৈঠক	...	...	৯১

গ্রন্থকারের অন্য বই ঃ

লেখা

সরস প্রবন্ধ ও গল্প—দাম ২৲

শুভশ্রী

সরস গল্পের বই—দাম ১৲
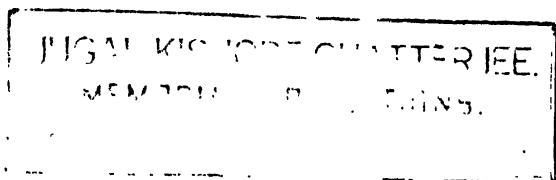
মজলিস

প্রথম বৈঠক

বৈঠকখানা রোডের একখানি দোতলা বাড়ীর বৈঠকখানায় প্রতি রবিবার সন্ধ্যায় একটি বৈঠক বসে। এই বৈঠকটি অতীব উচ্চাঙ্গের। পি. এচ-ডি., ডি. এস-সি., ডি. লিট্ প্রভৃতি ব্যতীত অপর কেহ এখানে প্রবেশ করিতে পারে না। তবে বিলাতফেরত ও মহিলাপক্ষে গ্র্যাজুয়েট (অনার্স সহ) হইলেও চলিতে পারে।

ইঁহাদের মধ্যে অনেকে আছেন, যাঁহারা দুইটি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডিগ্রী পাইয়াছেন; যেমন ড. ঘোষ (কলি-ও-ঢাকা), ড. বোস (ঢাকা বারাণসী-চ), ড. মিটার (বনারস-ঔর-ঢেলি), ড. কর (ডেল্‌হি-অ্যাণ্ড্-লণ্ড), ড. ব্যানার্জি (লোঁদ্র্-এ-পারি), ড. চ্যাটার্জি (পারি-উণ্ড-বের্লিন), ড. গাঙ্গুলি (বের্লিন-ই-রোমা) প্রভৃতি।

ইঁহাদের আলাপ-আলোচনা অতিশয় উচ্চশ্রেণীর। যাহাতে স্বাভাবিক মহাকর্ষের প্রভাবে কোন আলোচনা নিম্নস্তরে আসিয়া না পৌছে, সেজন্য এখানে সুব্যবস্থা আছে। প্রতি বৈঠকে একজন বিবেকরক্ষী নিযুক্ত হইয়া থাকেন। ইঁহার চেয়ারের পশ্চাতে ঘরের আলোর সুইচ। আলোটি সাধারণত একশত-বাতি-শক্তি-বিশিষ্ট। সুইচ বোর্ডে একটি রেগুলেটর আছে। ইহা ঘুরাইয়া আলো কমান-বাড়ান চলে। আলোচনার বিভিন্ন স্তরে বিবেকরক্ষী মহাশয়

রেগুলেটর দ্বারা ঘরের আলো কম-বেশি করিয়া আলোচনার লেভেল বৈঠকের অন্তর্গত ব্যক্তিদিগকে জ্ঞাপন করেন এবং তাঁহারাও তদনুসারে আলোচনার গুরুত্ব ও গাম্ভীর্য নিয়ন্ত্রণ করেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, যখন ব্রহ্ম-বিষয়ে আলোচনা হয়, তখন আলো স্বাভাবিক একশত-বাতি-শক্তিতেই থাকে ; যখন দার্শনিক আলোচনা হয়, তখন থাকে নব্বুইতে ; বৈজ্ঞানিক আলোচনার সময়ে আশিতে ; ভূগোল-ইকনমিক্স্ প্রভৃতির আলোচনায় সত্তরে ; ইতিহাসে ষাটে ; সাহিত্যে পঞ্চাশে ; সাইকলজিতে চল্লিশে ; আর্টে তিরিশে ; ইহার নীচে কোন আলোচনা নামিতে দেওয়া হয় না। কাহারও আলোচনা ইহার নীচে নামিতে চাহিলে, তাহার সেই আলোচনা ভাষার চাতুর্য দিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া আর্টের পর্যায়ে উন্নীত করিয়া লওয়া হয়। মোটকথা এই বৈঠকের পাশ-মার্ক তিরিশ বজায় রাখা চাই।

মজলিস বসিয়াছে। আজকার বিবেকরক্ষী ড. নন্দী। কথা আরম্ভ করিলেন ড. মুখার্জি।

ড. মুখার্জি। যাই বলুন, আমাদের ব্রহ্মের কন্‌সেপ্‌শন মানুষের চিন্তাজগতের ইতিহাসে অতুলনীয়। (আলো—১০০)

ড. মিটার। কিন্তু এটাকে কন্‌সেপ্‌শন বলা ঠিক হবে কি ? ব্রহ্ম-সম্বন্ধে কোন ধারণা তো আমরা করতে পারি না।

ড. মুখার্জি। ধারণা করতে পারি না বটে, কিন্তু তবু যুগ যুগ ধরে এদেশের সাধু এবং সাধকেরা এটাকে উপলব্ধি করবার চেষ্টা তো করেছেন—আর কেউ কেউ যে করেছেন, তা আমি বিশ্বাস করি।

ড. দে। আমার কিন্তু মনে হয়, ব্রহ্মকে সমগ্রভাবে কেউ নিজ জীবনে, ধারণাই বলুন, আর উপলব্ধিই বলুন, করতে পারে না। যা অবাঙ্‌মনসো গোচরম্, যা অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্, তাকে মানুষ মন

দিয়ে ধারণা করবে কেমন করে? কতকগুলি নেগেটিভ অ্যাট্রিবিউট দিয়ে একটা অস্পষ্ট কল্পনা মাত্র করা যেতে পারে হয়তো।

ড. মিটার। শুধু নেগেটিভ কেন, একমেবাদ্বিতীয়ম্, অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্ প্রভৃতি পজিটিভ অ্যাট্রিবিউটও তো আছে।

ড. মুখার্জি। সাধকেরা বলেন, সাধনার ফলে ঐসব অ্যাট্রিবিউটের পর্দা সরে গিয়ে আসল জিনিষটা বেরিয়ে পড়ে, আর সেটা সাধকের জীবনের সঙ্গে এক হয়ে যায়। তাঁরা আরও বলেন, নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া।

ড. দাস। কিন্তু সাধারণ লোকে তর্ক করবেই। যুক্তিতর্ক করতে করতেই তবে তর্কের বাইরে যেতে হবে। তবে কেউ যদি একেবারে হাত ধরে নিয়ে গিয়ে গন্তব্যস্থানে পৌঁছে দেন, তবে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা।

ড. মিটার। আমার ত মনে হয়, সাধারণের পক্ষে কতকগুলো অ্যাট্রিবিউট-এর কল্পনা করা ছাড়া উপায় নেই। সেইগুলো অবলম্বন করেই বুদ্ধিকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। উপনিষৎ সেই চেষ্টাই করেছে।

ড. চক্রবর্তী। আমাদের ঈশ্বর বা ভগবান সম্বন্ধে যে ধারণা, সেও তো কতকগুলি অ্যাট্রিবিউটের সমষ্টি। (আলো—৯৫)

ড. ঘোষ। যাঁরা ধ্যান, ধারণা, তপস্যা করেন, শুনেছি, তাঁরাও কতকগুলি অ্যাট্রিবিউট বা সেগুলির প্রতীক কতকগুলি বাস্তব সুপরিচিত পদার্থের কল্পনা দিয়েই আরম্ভ করেন।

ড. কর। শুধু আরম্ভ নয়, বহু সাধকের জীবন, অন্তত বাইরে থেকে যা মনে হয়, সারাজীবন একটা বিশিষ্ট সিম্‌বল নিয়েই কেটে যায়। একটা সিম্‌বল অবলম্বন করেই তাঁদের মনের সব বাঁধন ক্রমশ আল্‌গা হয়ে যায়। এই সিম্‌বলটাকে আপনারা যা ইচ্ছা বলতে পারেন।

ড. মিটার। আমার মনে হয় এই সিম্‌বল বা অ্যাট্রিবিউটের সমষ্টি থেকেই পৌত্তলিকতার উদ্ভব। যেটা আমরা মনে মনে তেমন

স্পষ্ট করে ভাবতে বা ধারণা করতে পারিনে, তা ছবি দিয়ে, পুতুল দিয়ে, ছড়া দিয়ে, কবিতা দিয়ে হয়তো পারি। প্রত্যেকটি দেবদেবীর মূর্তি কতকগুলি অ্যাট্রিবিউটের স্থূল নিদর্শন ছাড়া আর কি? (আলো—৯০)

ড. বোস। ব্রহ্ম বা ভগবান্ বা ঈশ্বর আছেন কি নেই, এখনো ঠিক হলো না। অথচ তাঁকে পাবার জন্য, তাঁকে উপলব্ধি করবার জন্য এত সব তপস্যা, সাধনা, পূজা, অর্চনা—এটা কি নেহাত—কি বলব—নেহাত বাজে ছেলেমানুষি নয়? আমার তো মনে হয়, ঈশ্বর ফিশ্বর কিছু নেই।

ড. মুখার্জি। কোন কিছু থাকা এবং না থাকার পার্থক্যটা সব সময়ে খুব সহজ ও স্পষ্ট নয়। এঘরে লোক আছে কি নেই—এ কথার উত্তর যত সহজ এবং এ দুইয়ের পার্থক্য যত স্পষ্ট, মানুষের জীবনে ও জ্ঞানে এমন অনেক ব্যাপার আছে, যাতে, আছে ও নেই এর প্রভেদ অত স্পষ্ট নয়।

ড. বোস। আছে এবং নেই, এর মধ্যে অস্পষ্টতা কি আছে? কোন কিছু হয় আছে, নয় তো নেই।

ড. মুখার্জি। জিনিসটা অত সোজা নয়। এই ধরুন, গণিতে কোন সংখ্যাকে তাই দিয়ে গুণ করলে গুণফল সর্বদাই পজিটিভ্ হয়। অর্থাৎ এমন কোন সংখ্যা নেই যার বর্গ নেগেটিভ। অথচ নেগেটিভ সংখ্যার বর্গমূল না হলে গণিত এক পাও চলতে পারে না। এখন কি বলবেন, নেগেটিভ সংখ্যার বর্গমূল আছে, না নেই?

ড. বোস। নেই, অথচ না হলে চলে না?

ড. মুখার্জি। হ্যাঁ, ভগবান্ সম্বন্ধেও একথা খাটে। ভগবান্ আছেন কি নেই, সে সম্বন্ধে সন্দেহ বা মতদ্বৈধ থাক্‌তে পারে, কিন্তু ভগবান্ না হলে আমাদের চলে না, এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

ড. মিটার। কিন্তু অনেকের তো ভগবান্ ছাড়াও বেশ চলে যায়!

ড. মুখার্জি। আপাতত তাই মনে হয় বটে, কিন্তু একটু ভাল করে দেখ্‌লেই দেখা যাবে, সকলেরই ভগবান্ আছে। তবে, হয়তো সকলের ভগবান ঠিক একই অ্যাট্রিবিউট দিয়ে গড়া নয়। বিজ্ঞানে যেমন কেন, কেন, করতে করতে এমন এক যায়গায় পৌছান যায়, যার পিছনে আর যাওয়া যায় না, তেমনি মানুষের জীবনে, চিন্তায়, ব্যবহারে এবং সাধনায়, যুক্তি ও তর্কের সাহায্যে চলতে চলতে এমন স্থানে এসে পৌছান যায়, যার পরে আর যুক্তি চলে না। সকলেই অবশ্য ঠিক এক-স্থানে বা একরূপে থামে না। যে যেখানে থামে, সেখানেই তার ভগবান্।

ড. চ্যাটার্জি। সম্ভবত এমনি করেই ভগবানের বহু রূপ, বহু মূর্তি উদ্ভাবিত হয়েছে।

ড. বোস। কুমোরটুলিতেই তার প্রকৃষ্ট পরিচয়! (আলো—৮৫)

ড. নন্দী। মানুষের ধর্মের ইতিহাস আলোচনা করলেও দেখা যায়, জীবনের ও সমাজের কঠিন সমস্যাগুলি যুক্তি ও তর্ক দিয়ে সমাধান করতে না পেরেই মানুষ একটা একটা ধর্ম, এক একটা নীতি গড়ে তুলেছে।

মিস্ চ্যাটার্জি (বি. এ.-ক্যাণ্টাব)। (সোফার স্প্রীংএর উপর ঈষৎ নাচিয়া) মানুষের ধর্ম আর নীতি যাই হোক, এই যে আমাদের তেত্রিশ কোটি দেবতা—এগুলো আমার কাছে ভা-রি বিচ্ছিরি লাগে।

ড মুখার্জি। বিচ্ছিরি লাগ্‌লে কি হবে? সাধারণ মানুষ একটা না একটা সিম্বল চাইবেই।

মিস্ চ্যাটার্জি। তবু আগের দিনের তুলনায় ঠাকুর-দেবতার মূর্তিগুলো আজকাল একটু বেশি আর্টিস্টিক, একটু বেশি হিউম্যান, এটাও মন্দের ভাল।

ড. চ্যাটার্জি। আপনি যেটাকে ভাল বল্‌ছেন, ওটাকে কিন্তু আমি ভাল বল্‌তে পারছিনে। দেবদেবীর মূর্তি এক একটা বড় আইডিয়ার সিম্‌বল, আপনার আমার ফোটো নয়। এই সেদিন হাঁসের ডানা দিয়ে ঢাকা একটা সরস্বতীর মূতি দেখলাম। তাতে সরস্বতীর 'স'-ও নেই। সেদিন ড. পুরকায়স্থ তো বল্‌ছিলেন, মধ্যযুগের কোন একটা ছবিতে হংসমানবীর একটা অস্বাভাবিক প্রণয়ের দৃশ্য দেখেছিলেন, এ নাকি তারি একটু পরিবর্তিত অনুকরণ। আমার ধারণা, দেবদেবীর মূর্তি গড়তে শাস্ত্রের আইডিয়াগুলিকেই রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা উচিত। দেবদেবীর মূর্তি আর ফিল্মস্টারের মূর্তি একরকম হলে চল্‌বে কেন? (আলো—৮০)

ড. বোস। ঠিক বলেছেন, মা দুর্গাকে জর্জেট পরানো কখনো উচিত নয়।

মিস্ চ্যাটার্জি। ওসব ডিটেলে না গিয়েও মোটের উপর এটা ঠিক যে সিম্‌বল নিয়ে এতটা বাড়াবাড়ি কাল্‌চারের অভাব বলেই ধরে নেওয়া যেতে পারে।

ড. মুখার্জি। দেখুন, সিম্‌বল যাই হোক, গির্জা বা 'সমাজ'-এর মত সরলই হোক, আর দুর্গাপ্রতিমার মত ইলাবোরেটই হোক, একটা কিছু থাকবেই।

ড. বোস। কোন কিছুরই বা দরকার কি? অনেক লোক আছে, তারা তো কিছুরই ধার ধারে না।

ড. মিটার। সরি, এমন লোক আছে বলে মনে হয় না। থাকলেও তাদের সংখ্যা নগণ্য। বুঝতে হবে, তারা অ্যানিম্যাল ইন্‌স্‌টিংক্টের উপরে উঠতে পারেনি। জীবন থেকে ভগবান্‌কে বাদ দিলে অবশিষ্ট থাকে শুধু বেঁচে থাকবার একটা জৈব প্রবৃত্তি। অর্থাৎ মানুষ মানুষ

থাকে না। যে সব আর্ট, যে সব আইডিয়ালিজ্‌ম মানুষকে পশু থেকে ভিন্ন করে রেখেছে, সে সব বাদ পড়ে যায়। একটু খোঁজ নিলেই দেখবেন, a godless person can never be a true artist.

মিস্ চ্যাটার্জি। আর্টের সঙ্গে ভগবানের কি সম্বন্ধ? (আলো—১০)

ড. মুখার্জি। তা আছে বৈ কি। গান বলুন, চিত্রাঙ্কণই বলুন, কবিতা লেখাই বলুন, এসবের পিছনে একটা creative instinct লুকানো আছে। যার জীবনে ভগবান নেই, সে কিছু create করতে পারে না। কারণ, কিছু create করতে গেলেই নিজেকে ভুলতে হয়। যার জীবনে ভগবান নেই, সে নিজেকে ভুলতে পারে না।

ড. বোস। আপনার কথাটা বোধ হয় ঠিক। নিজেকে না ভুললে কবিতা লেখা যায় না। এই সেদিন কি খেয়াল হল, কলম নিয়ে বসলাম কবিতা লিখ্‌তে। আপনারা হাসবেন না—আমি কলমে যা লিখলাম, আর মনে যা ভাবলাম, তা আপনাদের শোনাচ্ছি:

কোকিল ডাকিছে গাছে (রামাটা এখনো বাজার থেকে ফিরল না) —জোছনা-প্লাবিত ধরা (মিঃ গাঙ্গুলীর ঠিকানাটা যেন কি?)—মলয় বহিয়া যায় (অ্যাণ্ডারসন কোম্পানির শেয়ারটা কালই বেচে ফেলতে হবে)—বিরহ-বিধুর আঁখি (ছেলেমেয়েদের এখনো টিকা দেওয়া হয়নি)—ইত্যাদি। কলম রেখে উঠে পড়লাম।

(আলো—৫৫)

ড. মুখার্জি। (হাসিয়া) আপনি কবিতা লেখার চেষ্টা করবেন না।

মিসেস্ নন্দী। আচ্ছা, ঠাকুরবাড়ীর আর্ট আপনাদের ভাল লাগে?

ড. মিটার। আমি আর্টের বিশেষ কিছু বুঝিনে, তবে বুঝিয়ে দিলে মন্দ লাগে না।

মিসেস্ নন্দী। আমারও সেই কথা। যদি কেউ ছবিগুলো ধরে ধরে ভাল করে বুঝিয়ে দেয় তো বেশ লাগে। নইলে ভাল লাগে না।

মিস্ চ্যাটার্জি। আচ্ছা, বলুন তো মাইকেল এঞ্জেলো বড়, না আমাদের অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বড়?

ড. নন্দী। এ তুলনা ঠিক হলো না। একজন ইতালির পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক, আর একজন বাংলার উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর লোক। এ তুলনা চলতে পারে না।

মিস্ চ্যাটার্জি। আচ্ছা, রুবেন্স্?

ড. নন্দী। সেও তো ষোড়শ শতাব্দীর লোক। তাছাড়া ভিন্ন দেশের ভিন্ন ট্রাডিশনে গড়ে ওঠা শিল্পীদের পরস্পর তুলনা করলে দুজনের প্রতিই অবিচার করা হয়। (আলো—৪৫)

ড. বোস। আলো কমে গেছে, আমাদের আলোচনার বিষয় একটু উপরের দিকে তুল্‌তে হবে।

মিস্ চ্যাটার্জি। (সোফার স্প্রীংএর উপর ঈষৎ দুলিয়া) আচ্ছা, আপনাদের এই থিওরি অফ ইভোলিউশন ব্যাপারটা কি?

ড. ব্যানার্জি। ওটা নেহাতই গোলমেলে ব্যাপার—অল্প কথায় বোঝান যায় না। (আলো—৭০)

মিসেস্ নন্দী। ইংরেজিতে সব বৈজ্ঞানিক বিষয়েই পপুলার বই আছে। যারা যে বিষয়ে অভিজ্ঞ নয়, তারা সেই সব বই পড়ে একটা মোটামুটি ধারণা করতে পারে। বাংলায়ও যদি তেমনি হয়, তবে বেশ হয়। আপনারা চেষ্টা করেন না কেন?

ড. মিটার। চেষ্টা তো হচ্ছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ আসরে নেমেছেন। আরো অনেকেই চেষ্টা করছেন। এপথেও প্রধান বাধা, পড়ুয়ার অভাব।

শিক্ষিত লোকেরও যেমন অভাব, বই কিন্‌বার অর্থেরও তেমনি অভাব। স্কুল বা কলেজের পাঠ্যতালিকার বাইরে কোন বই কেউ কেনে না।

ড. মুখার্জি। একথা খুব সত্যি। তবু দেখ্‌তে পাই, ছেলেমেয়েদের জন্য আজকাল অনেক ভাল বই বেরিয়েছে, যাতে নানারকম বিজ্ঞানের কথা সরলভাবে বোঝান থাকে। এটা সুলক্ষণ।

ড. বোস। স্কুলের নূতন নিয়মে যে বিজ্ঞানচর্চার ব্যবস্থা হয়েছে, সেটাও আমি মনে করি, এ মুভ্‌ ইন্‌ দি রাইট ডিরেক্‌শন। সেদিন আমার ছোট মেয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করছিল, 'বল তো, ব্যাঙ্‌ কয় রকম?' আমরা কখনো ওসব পড়েছি?

ড. নন্দী। শুধু বিজ্ঞান কেন, সাহিত্য, ভূগোল, ইতিহাস, এসব বিষয়েও সাধারণের জ্ঞানলিপ্সা অনেক বেড়েছে। সাধারণ জ্ঞান, দেশ বিদেশের খবর, এসব জানবার জন্য কৌতূহলও বেড়েছে বলেই মনে হয়।

ড. ব্যানার্জি। আমার মনে হয়, এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি লোক খবরের কাগজ পড়ে।

ড. বোস। সেদিন দেখলাম, আমাদের হেড-মিস্ত্রী খবরের কাগজ পড়ছে। এ ব্যাপারটা আমাদের দেশে একটু নূতন। (আলো—৬০)

ড. নন্দী। শুধু খবরের কাগজ নয়, সাহিত্যচর্চাও বোধ হয় আগের চেয়ে একটু বেড়েছে।

ড মুখার্জি। সে নাম মাত্র। সাহিত্যিকদের দুরবস্থাই তার প্রমাণ। কোন ভাল বই-ই দু'এক সংস্করণের বেশি চলে না।

ড. ব্যানার্জি। এ অবস্থার উন্নতি সহজে বা শীঘ্র হবে না। আর্থিক এবং মানসিক, দুই প্রকার উন্নতি না হলে এ বিষয়ে কোন উন্নতির আশা নেই। কোনটাই শীঘ্র হবার নয়।

মিস্ চ্যাটার্জি। (সোফার স্প্রীংএর উপর একটু হেলিয়া) আপনারা সাহিত্যের উন্নতি দেখে আনন্দিত হচ্চেন, কিন্তু আমি তো তেমন আশার কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছিনে। গল্প আর উপন্যাস মন্দ বেরুচ্ছে না। কিন্তু কবিতা? কই, একটা বড় ভাল কাব্য বাংলায় আছে? মাইকেল, নবীন সেনের কথা বাদ দিন। তারপর যোগীন বোসের শিবাজী আর পৃথ্বীরাজ ছাড়া একটা বড় কবিতা কেউ লিখেছেন? দু'পৃষ্ঠার পরই কবিদের কল্পনার দম ফুরিয়ে এলিয়ে পড়ে।

ড. বোস। ঠিক বলেছেন, এসব আড়াই-পেজি কল্পনায় কাব্য হয় না। (আলো—৫৫)

মিস্ চ্যাটার্জি। (সোফার স্প্রীংএর উপর একটু কাত হইয়া) আর নাটক? দু'চারখানা থার্ড ক্লাস নাটক ছাড়া, বিংশ শতাব্দীর বাংলা কখানা নাটক লিখেছে?

ড. নন্দী। আচ্ছা, ড. দে, ড. দাস, ড. চক্রবর্তী, কই আপনারা তো কিছু বলছেন না?

ড. দাস। আমরা শুনছি।

ড. চক্রবর্তী। আপনাদের তর্কের জন্য আমি সিগারেট স্যাক্রিফাইস্ করতে পারব না। তাছাড়া, নভেল নাটকে আমি ইন্‌টারেস্ট পাই না।

মিসেস্ নন্দী। মিসেস্ চক্রবর্তী তো খুব নভেল পড়েন। জাহ্নবী লাইব্রেরীতে কোন নভেলের জন্য স্লিপ দিলেই শুনি, বই মিসেস চক্রবর্তী নিয়ে গেছেন।

ড. চক্রবর্তী। হ্যাঁ, তা ওঁর একটু ওদিকে ঝোঁক আছে। (আলো—৫০)

ড. দে। আচ্ছা, মিষ্টার ভট্টাচার্যের তো আসবার কথা ছিল। তিনি তো এলেন না?

ড. মুখার্জি। তাঁর আজ মি. গুহর ওখানে নেমন্তন্ন। গুহর মেয়েকে আজ নাকি দেখ্‌তে আস্‌বে।

মিস্ চ্যাটার্জি। (সোফার স্প্রীংএর উপর একটু নড়িয়া), দেখুন, এই যে মেয়ে-দেখা ব্যাপারটা, এটা বার্বারাস। এ ওম্যান ইজ্ নট এ পিস্ অফ্ ফাঃ—নিচাঃ।

ড. মুখার্জি। তা নয়, মানি। কিন্তু না দেখে বিয়ে তো আজকাল কোন দেশেই হয় না। কাজেই দেখা সম্বন্ধে বোধ হয় আপনার অমত নেই। তবে, দেখার মেথড্ নিয়ে আপনার আপত্তি, কেমন?

মিস্ চ্যাটার্জি। (সোফার স্প্রীংএর উপর সোজা হইয়া) যদি বলি, তাই।

ড. মুখার্জি। আপনি তো ওদেশে অনেক দিন ছিলেন। ওরা যেমন করে মেয়ে দেখে বিয়ে করে, সেটা আপনার পছন্দ হয়? আপনার মুখে উত্তর না শুনেও আমি বল্‌তে পারি, আপনি পছন্দ করেন না। তা যদি না করেন, তবে, আমাদের এই প্রথা ছাড়া উপায় কি? আমার তো মনে হয়, এটাই বরং ভাল, মেয়েদের ভাবী স্বামী বা স্বামীর আত্মীয়-স্বজনের কাছে একটু দেখা দেওয়া, দুএকটা কথা বলা, এক আধটা গান গাওয়া, এসব ইস্কুলের রেসিটেশনের মতই সহজ। এর বদলে, দিনের পর দিন, একের পর এক ভাবী বা সম্ভাবী স্বামীর সঙ্গে অবাধে মিশে শরীর মন ভেঙে তারপর বিয়ে করা বা না করাটাই কি ভাল মনে করেন? (আলো—৪৫)

মিসেস্ নন্দী। থাক্ গে ওসব কথা। নমিতার (মিস্ চ্যাটার্জি) সব বিষয়েই একটু স্ট্রং ওপিনিয়ন।

ড. বোস। ড. মুখার্জিও কম যান না।

ড. নন্দী। (কথার মোড় ফিরাইবার জন্য) আচ্ছা, ড. দাস,

২

গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দার গল্পগুচ্ছখানা আপনার পড়া হয়েছে? কেমন লাগল?

ড. দাস। বেশ লাগল। বই পড়ে ইচ্ছে করছে, সার্ডিনিয়াটা একবার ঘুরে আসি।

ড. দে। আচ্ছা, বলুন তো, কাকে আপনার বড় বলে মনে হয়—গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দা, না আমাদের অনুরূপা দেবী?

ড. নন্দী। আমি তো আগেই বলেছি, এরকম তুলনা চল্‌তে পারে না। তাছাড়া এমন তুলনা করে লাভই বা কি?

মিস্ চ্যাটার্জি। (সোফার স্প্রীংএর উপর একটু চাপিয়া) লাভ আর কি? ওরা বড় না আমরা বড়, এটা নিয়ে তর্ক করতে একটু ভাল লাগে।

মিসেস্ নন্দী। যা বলেছ! (আলো—৪০)

ড. দে। এক্‌স্‌কিউজ্ মি, আমাকে এখন উঠতে হচ্ছে।

ড. দাস, ড. ব্যানার্জি, মিসেস নন্দী। কেন, এত সকালেই? আপনার বাড়িতে তো গার্জেন নেই!

ড. দে। না, তা নয়। আমি যাব একবার ড. তরফদারের বাড়ীতে। সেখানেই ডিনার খাব।

ড. মুখার্জি। ড. তরফদারকে অনেকদিন দেখিনি। তাঁরা সব আছেন কেমন? তাঁর মেক্সিক্যান ওয়াইফ ফিরে এসেছে?

ড. দে। হ্যাঁ, এই মাসখানেক হলো। ওঁরা একটু অশান্তিতে আছেন।

ড. বোস, ড. ব্যানার্জি, ড. দাস, মিসেস নন্দী। কেন, কি হয়েছে? ডাইভোর্স হবে নাকি? (আলো—৩০)

ড. দে। না, ওরকম কিছু না।

ড. দাস। তবে?

ড. নন্দী। তবে?

ড. ব্যানার্জি। তবে?

ড. চক্রবর্তী। তবে? (আলো—২৫)

ড. দে। আচ্ছা, আজ উঠি। আরেক দিন হবে।

ড. নন্দী। একটু বসুন না। ওরে—কে আছিস—বয়—সিগারেটের টিনটা নিয়ে আয় তো।

মিসেস্ নন্দী। সবে তো আটটা; আপনার ডিনারের এখন অনেক দেরি।

ড. বোস। ব্যাপারটা কি, শোনাই যাক্না। আমার মনে হচ্ছে —(আলো—২০)

ড. দে। কাগজে বোধ হয় পড়েছেন, ড. পাকড়াশী পরশু রাত্রে ওয়ালটেয়ার গেছেন।

ড. দাস, ড. বোস, ড. ব্যানার্জি। পড়েছি বৈকি!

ড. দে। ব্যাপারটা তাঁকে নিয়েই। (আলো—১৫)

ড. দাস। কেন, কি হয়েছে? আপনার কথার সুরে যেন মনে হচ্ছে—(আলো—১০)

ড. দে। মিসেস তরফদারের সেই গভর্ণেস্‌টিকে আপনারা দেখেছেন বোধ হয়? (আলো—৫)

ড. দাস। দেখছি বৈকি! এ স্প্লেন্‌ডিড্ লেডি!

ড. দে। তিনিও সেই ট্রেণেই ওয়ালটেয়ার চলে গেছেন। (ঘর—অন্ধকার)

কিছুক্ষণ চাপা গলায় কথাবার্তা, নানা সুরে নানা ভঙ্গীতে হাসি চলিতে লাগিল। হঠাৎ বিবেকরক্ষী মহাশয়ের গলা শোনা গেল।

ড. নন্দী। তারা! ব্রহ্মময়ী! মা! (আলো—১০০)

মে, ১৯৪০

দ্বিতীয় বৈঠক

মজলিস বসিয়াছে। বিবেকরক্ষা এবং আলোক-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা পূর্ববৎ। আজকার বিবেকরক্ষীও ডঃ নন্দী।

ড. নন্দী। আজ প্রথমেই একটা কথা আমায় বল্‌তে হচ্ছে। সেদিন আমাদের আলোচনা বড্‌ড নীচে নেমে গিয়েছিল। আমাদের সকলেরই এ বিষয়ে অবহিত হওয়া উচিত। আমাদের ভুল্‌লে চলবে না যে, আমরা একটা উচ্চ প্লেনের অধিবাসী। আমাদের চিন্তা, আমাদের আলোচনা যেন কখনই অমন নিম্নভূমিতে নেমে না আসে।

ড. দে। আপনি ঠিকই বলেছেন, আমাদের সকলেরই এবিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত।

ড. বোস। এই সাবধানতার আবশ্যকতাটাই আমার কাছে লুডিক্রাস্ মনে হচ্ছে। আমাদের কালচার্ড মনগুলো তো উঁচুতেই থাকে। নেমে আসাটা একটা অ্যাক্‌সিডেন্ট্।

ড. মুখার্জি। অ্যাক্‌সিডেন্টটা যেন ঘন ঘন না হয়! এবিষয়ে আমাদের দায়িত্বটা কত বড়, তা আমাদের মনে রাখ্‌তে হবে। গীতায় আছে, যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তদেবেতরো জনঃ। স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্তে॥ আমাদের মনে রাখ্‌তে হবে, আমরা হচ্ছি সমাজের ইণ্টেলেকচুয়াল পাইলটস্। আমরা যা ভাব্‌ব, যা বল্‌ব, অপর লোকে, অর্থাৎ অ-ডক্টর অ-বিলেত-ফেরত লোকরাও তাই ভাব্‌বে, তাই করবে। আমরা যেন আমাদের এই মহান্ দায়িত্ব ভুলে না যাই।

ড. নন্দী। আজকার আলোচনাটা আরম্ভ করা যায় কি দিয়ে?

ড. মিটার। আরম্ভটা ব্রহ্ম দিয়েই হোক। আলোটা তো একশ'তেই আছে।

ড. বোস। ব্রহ্ম সম্বন্ধে আলোচনায় কোন অসুবিধে নেই। কারণ সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। সুতরাং যে-কোন বিষয়ে আলোচনা করলেই সেটা ব্রহ্ম বিষয়েই হবে। ব্রহ্মের বাইরে তো কিছু নেই!

মিস্ চ্যাটার্জি। (সোফার স্প্রীংএর উপর ঈষৎ নাচিয়া) তাই যদি হয়, তবে এসব বিবেকরক্ষা, আলোর খেলা, এসবের কি দরকার?

ড. দে। দরকার আসলে কিছু নেই। তবে কি-না আমাদের মজলিসের বিশেষত্ব, সুতরাং—

ড. ঘোষ। ওটা বজায় রাখ্‌তেই হবে।

ড. মুখার্জি। এই যে, সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, একথাটার তাৎপর্য সত্যই খুব গভীর। (আলো—১০০)

ড. দে। নিশ্চয়ই। আমরা যা-কিছু দেখি, শুনি, অনুভব করি—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং অতীন্দ্রিয় যা-কিছু আছে, সবই মূলত এক এবং অদ্বিতীয় সত্তার মধ্যে বিলীন; এটা মনে, জ্ঞানে, ধ্যানে আয়ত্ত করা এক মহাকঠিন ব্যাপার। মানুষের মন অতটা তীক্ষ্ণ, অতটা গভীর, অতটা স্বচ্ছ, অতটা নির্মল, অতটা পবিত্র যে হতে পারে, সেটা কল্পনা করাও কঠিন।

ড. নন্দী। সেই জন্যই তো আমরা শুনি, ইতিহাসে পড়ি, এই অদ্বৈত সাধনায় সিদ্ধিলাভ করবার জন্য শঙ্করাদি কত মহাপুরুষ জীবনপাত ক'রে গেছেন। কৃতকার্য কতদূর হয়েছেন, তা আমাদের পক্ষে বিচার করা যেমন কঠিন, তেমনি অসম্ভব।

ড. ব্যানার্জি। এ যুগের একটা প্রধান বিশেষত্ব এই যে, আমাদের চিন্তাধারা তথাকথিত বৈজ্ঞানিক যুক্তিধারা অবলম্বন ক'রে চল্‌তে চায়। এপথে কিন্তু বেশি দূর এগনো যায় না। সেই জন্যই বেদ, উপনিষদ্ প্রভৃতির প্রতি অনেক আধুনিক পণ্ডিতদের একটা উপেক্ষার ভাব দেখা

যায়। এই কারণেই দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ বা অন্য কোনপ্রকার দার্শনিক মতবাদই বর্তমান যুগের যুক্তিবাদের কাছে শ্রদ্ধা পায় না।

ড. মুখার্জি। এসব দার্শনিক বাদের মধ্যে কি যুক্তি নেই? দার্শনিকরাও তো যুক্তির সাহায্যেই তাঁদের মতবাদ সমর্থন করেন।

ড. ব্যানার্জি। কিন্তু দার্শনিক যুক্তির ধারা, আর আজকালকার বৈজ্ঞানিক যুক্তির ধারা ঠিক একপ্রকার নয়। দুটোর ফিল্ড্ই আলাদা। একটা মনোজগতের এবং তারও উপরের ব্যাপার, আর একটা ল্যাবরেটরির ব্যাপার। এ দুটো ধারার সামঞ্জস্য সহজ নয়।

ড. বোস। সামঞ্জস্য নাই বা হ'ল। যদি সত্যিই মানুষের মন কোনদিন একটা সর্বশ্রেষ্ঠ যুক্তির ধারা মেনে চল্তে সমর্থ হয়, তখন সামঞ্জস্য আপনিই হবে। নতুবা ধরে বেঁধে, টিকি আর ইলেক্ট্রিসিটির মত, একটা ছেলে-ভুলোনো যুক্তির ছড়া বেঁধে মিষ্টিসিজ্ম্ আর র‍্যাশন্যালিজ্মের আধ-সিদ্ধ খিচুড়ি না পাকানোই ভাল।

মিস্ চ্যাটার্জি। ড্যাম্ ইয়োর মিষ্টিসিজ্ম্। ওসব ইয়ে আজকালকার দিনে শিকেয় তুলেই রাখা উচিত। যা চোখে দেখা যায় না, যা কোন ইন্দ্রিয়ের গোচর নয়, যা লেবরেটরিতে পরীক্ষা করা যায় না, এক কথায় যা—এক, দুই, তিন, চার ক'রে গোনা যায় না, এযুগে তার কোন মূল্যই নেই। (আলো—৮০)

ড. বোস। অন্তত এ মজলিসের সভ্য ও সভ্যাদের মধ্যে সবাই যে পিওর র‍্যাশনালিস্ট, সে বিষয়ে তো কোন সন্দেহই নেই।

ড. চক্রবর্তী। বেশি জোর করে কিছু বলা যায় না।

ড. বোস। মানে?

ড. চক্রবর্তী। আমার ধারণা, আমরা সকলেই বাইরে র‍্যাশন্যাল, ঘরে মিষ্টিক।

মিস্ চ্যাটার্জি। অফ্ কোর্স নট্! তাই যদি হয়, আমি প্রস্তাব আন্‌বো, আমাদের মজলিসে মিস্টিকতা চল্‌বে না।

ড. বোস। আবার প্রস্তাব? সেবারের সে প্রস্তাবের কথা মনে আছে তো?

ড. দে। কোন্ প্রস্তাব? আমি তো জানিনে কিছু!

ড. বোস। আপনি তখনো মজলিসে আসেন নি। একবার আমরা প্রস্তাব করিয়াছিলাম, যে আমাদের মজলিসে চাকরি, মাইনে, ট্রান্সফার, প্রমোশন আর টেল-বেয়ারিং, এ কয়টা আইটেম বাদ দিতে হবে। প্রস্তাবটা ইউন্যানিমাস্‌লি পাশ হয়ে গেল। তারপর দুমাসের মধ্যে আমাদের সভ্য-সংখ্যা ১৪২ থেকে নেমে ৩৭-এ এসে দাঁড়াল।

মিস্ চ্যাটার্জি। তা হোক্ গে। র‍্যাশন্যালিজ্‌ম্‌ই যদি আমাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং নৈতিক প্রিন্সিপ্‌ল্ হয়, তা হলে তার জন্য সব রকম ত্যাগ স্বীকারের জন্যই প্রস্তুত থাকতে হবে।

ড. দে। আপনি ঠিকই বলেছেন, মিস চ্যাটার্জি। আমাদের প্রিন্সিপ্‌ল্ ঠিক রাখ্‌তে হবে বৈকি। (আলো—৬০)

মিসেস ভৌমিকের প্রবেশ

ড. নন্দী। এই যে মিসেস্ ভৌমিক, নমস্কার!

মিসেস্ ভৌমিক। নমস্কার! নমস্কার! সবাইকেই নমস্কার! একটু দেরী হয়ে গেছে, না? কি করি, এক দালাল এসে যা এক রাবিশ গাড়ী গতিয়ে দিয়ে গেছে! পঞ্চাশ মাইলের বেশি স্পীডই হয় না।

মিস্ চ্যাটার্জি। (সোৎসাহে) আপনি গাড়ী বদ্‌লেছেন বুঝি? কত টাকায় কিন্‌লেন, ইফ্ ইউ ডোণ্ট মাইণ্ড্?

মিসেস্ ভৌমিক। কিনেছি ন'শ টাকায়, তবে মজলিসের বাইরের লোকের কাছে বলি, উনত্রিশ শ'।

মিস্ চ্যাটার্জি। কেন বলুন তো ?

মিসেস্ ভৌমিক। আমার পোজিশনের লোকের ন'শ টাকার গাড়ীতে বেড়ানটা—বোঝেনই তো! তাছাড়া সত্য কথা বল্‌তে কালচারে বাধে। (আলো—৪০)

ড. মিটার। যাক্ গে। আজ আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয়—ন্যাশনালিজম্। মিসেস্ ভৌমিকের এ বিষয়ে বক্তব্য কি ?

মিসেস্ ভৌমিক। আই অ্যাম্ আউট এ্যাণ্ড্ আউট এ ন্যাশনালিস্ট, এতে আপনাদের কারো কোন সন্দেহ আছে নাকি ?

ড. বোস। সন্দেহ একেবারেই নেই।

মিসেস্ ভৌমিক। রাওয়ালপিণ্ডিতে এতদিন ছিলুম, আমার ন্যাশনাল মোড্ অফ্ লিভিং দেখে সবাই অবাক্ হত। কোন রকম বস্তা-পচা সেণ্টিমেণ্ট কোনদিন আমার কাছে অ্যাপীল করে নি।

মিস্ চ্যাটার্জি। তাই তো চাই আমরা। বাংলা দেশটা কেমন যেন মিয়িয়ে যাচ্ছে। আমাদের দেখ্‌তে হবে, যাতে সারা বাংলা আবার চাঙা হয়ে উঠ্‌তে পারে।

ড. নন্দী। আমাদের ডঃ পুরকায়স্থ এবার ট্রায়াম্ফ্ অফ্ ন্যাশনালিজ্‌ম্ সম্বন্ধে যে বইখানা লিখেছেন, আমাদের উচিত সেখানা খুব প্রচার করা। মিস্ চ্যাটার্জি নিশ্চয়ই বইখানা পড়েছেন।

মিস্ চ্যাটার্জি। পড়িনি এখনও। তবে রিভিয়ু দেখেছি, শিগ্‌গিরই পড়্‌বার ইচ্ছা আছে।

ড. নন্দী। হ্যাঁ, আপনারা সকলেই পড়্‌বেন আশা করি। বইখানা সত্যই যুগোপযোগী হয়েছে। (আলো—৫০)

ডঃ ভট্টাচার্যের প্রবেশ

ড. নন্দী। এই যে ডঃ ভট্টাচার্য, আসুন, নমস্কার।

ড. ভট্টাচার্য। নমস্কার, গুড্ ইভনিং টু এভরিবডি।

ড. মিটার। আগেই আমরা আপনাকে কন্‌গ্রাচুলেশন্স জানাচ্ছি। আপনার অ্যামস্টারডাম রিভিয়ুয়ের সেই পেপারটা—থিওরি অ্যাণ্ড প্রাক্‌টিস্ অফ্ লুনার এক্‌লিপ্‌স্—খুব ভাল হয়েছে।

মিস্ চ্যাটার্জি। তাই নাকি! আমি তো দেখিনি এখনো।

ড. নন্দী। পরে দেখ্‌বেন—একটা চমৎকার র‍্যাশন্যালিস্টিক আউট্‌লুক।

মিস্ চ্যাটার্জি। নিশ্চয়ই পড়্‌ব। ডঃ ভট্টাচার্য, একখানা বই কিন্তু আমি চাই।

ড. ভট্টাচার্য। বেশ তো!

ড. মুখার্জি। মিস্ চ্যাটার্জি, আপনার পড়া হলে বইখানা আমাকে দেবেন কিন্তু।

ড. মিত্র। আপনার পড়া হয়ে গেলে আমাকে দেবেন।

ড. বোস। আপনাদের সবার পড়া হয়ে গেলে আমি যেন একবার পাই! (আলো—৬০)

ড. নন্দী। আচ্ছা, আজ ডঃ বটব্যাল তো এলেন না!

ড. দে। বটব্যাল তো পাগল হয়ে গেছেন। বোধ হয় রাঁচীতে আছেন।

ড. মিটার। সে কি! কালও তো তাঁর সঙ্গে বেচু চাটার্জি স্ট্রীটের মোড়ে দেখা। সে রকম কোন লক্ষণ ত—

ড. দে। শুধু দেখে ঠিক বোঝা যায় না।

ড. চক্রবর্তী। কেন, পরশুদিন তো তার সঙ্গে জুটফোরকাস্ট্ নিয়ে দু'ঘণ্টা আলোচনা হ'ল। কোন রকম ইল্‌লজিক্যাল—

ড. দে। শুধু কথা বল্‌লে বোঝা যায় না।

ড. ভট্টাচার্য। আমি তো গত সামারে দুমাস দেরাদুনে ওঁর বাসায় ছিলাম। একসঙ্গে থাকা, একসঙ্গে খেলা, একসঙ্গে বেড়ান, একসঙ্গে শীকারে যাওয়া—সবই তো ক'রেছি। কই, কোনরকম ইডিওসিন্‌ক্রেসিও তো আছে বলে মনে হ'ল না!

ড. দে। এগ্‌জ্যাক্ট্‌লি! ওঁর পাগলামির আসল লক্ষণই এই যে 'কেউ জান্‌তি পারে না'। (আলো—৪০)

মিস্ চ্যাটার্জি। ডঃ দে, এটা আপনার 'উইশ্‌ফুল থট্' নয় তো!

মিসেস ভৌমিক। কিম্বা একটা সাইকলজিক্যাল নেসেসিটি।

ড. দে। কি যে বলেন আপনারা!

ড. সিংহ। কিংবা একটা এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট ইন্ অটোসাজেস্‌শন! দশজনে মিলে বল্‌তে বল্‌তে যদি সত্যিই—

ড. দে। আপনারা ভারি ইয়ে—

ডঃ সিংহ। আমার কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেবেন না। আমাদের সাইকলজি-শাস্ত্রে ওটা কিন্তু একটা খুব প্রচলিত থিওরি—অনেক এক্‌স্‌পেরিমেণ্টের নজির আছে। তাছাড়া, ডঃ বটব্যাল এরকম এক্‌স্‌পেরিমেণ্টের পক্ষে খুব কন্‌ভিনিয়েন্ট্ সাবজেক্ট—একটু শাই, একটু সেণ্টিমেণ্টাল, একটু সেন্‌সিটিভ্— (আলো—২০)

ড. নন্দী। দেখুন, আমাদের কথার মধ্যে বড় বেশি ইংরেজি কথা ঢুকে যাচ্ছে।

ড. সিংহ। সরি। আচ্ছা, এখন থেকে একটু সাবধান হওয়া যাবে।

ড. চক্রবর্তী! তাছাড়া, আমাদের আলোচনাগুলো বড় এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। আজকের আসল বিষয়টা কিন্তু র‍্যাশনালিজ্‌ম্।

মিসেস ভৌমিক। দেখুন, একটু আনন্দ, একটু বিশ্রাম, একটু

আড্ডা—এর জন্যই এখানে আসা। এখানেও যদি লজিক আর ইউটিলিটির নিক্তিতে ওজন ক'রে কথা বল্‌তে হয়, তাহ'লে তো ভারি মুস্কিল।

ড. নন্দী। না, অতটা অবশ্য নয়। তবে আমাদের মজলিসের বিশেষত্ব, মানে একটা হায়আর ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল লেভেল—সেটা থেকে বেশি না নামলেই হ'ল। (আলো—৪০)

ড. দে। আপনারা যাই বলুন, সত্যিই ডঃ বটব্যাল—

ড. মুখার্জি। আবার বটব্যাল! অন্য কথা পাড়ুন।

মিসেস্ ভৌমিক। দেখুন, মজলিসটা মোটেই যেন জম্‌ছে না।

ড. চক্রবর্তী। কেন বলুন তো?

মিসেস্ ভৌমিক। আপনারা তো দেখ্‌ছি মোটে আটাশ জন। এত অল্প লোকে কি আড্ডা জমে? আমাদের রাওলপিণ্ডিতে তো কোরামই হয় পঞ্চাশ জনে।

ড. চক্রবর্তী। এটা বাংলাদেশ কি না। এখানে সবই একটু ছোট-ছোট। আপনাদের রাওলপিণ্ডিতে সবই একটা গ্র্যাণ্ড স্কেলে হয়। এই নিন্, একটা সিগারেট খান।

মিসেস্ মৌমিক। (সিগারেট ধরাইয়া) থ্যাঙ্ক্‌স্।

ডঃ করের প্রবেশ

ড. বোস। এই যে ডঃ কর, এত দেরী যে!

ড. কর। আর বলেন কেন, একটা নারী সমিতিতে গিয়ে পড়েছিলাম, বেরুতে দেরী হয়ে গেল।

মিসেস্ ভৌমিক। আপনি নারী সমিতিতে গেলেন কি হিসেবে?

ড. কর। আমার স্ত্রীর স্বামী-হিসেবে। সেখানে আজ দুটো খুব উচ্চাঙ্গের প্রস্তাব পাশ হয়েছে।

ড. মুখার্জি। ইউ মীন, খুব র‍্যাশন্যাল প্রস্তাব।

ড. কর। হ্যাঁ। একটা প্রস্তাব হচ্ছে যে, নারীরা এখন থেকে ঠিক পুরুষদের নৈতিক আচরণ হুবহু নকল করবে। আমি একটা সংশোধন প্রস্তাব করেছিলাম, 'আমাদের সমাজে পুরুষেরা নারীর প্রতি যে সকল অবিচার করে, তার প্রতিবিধানকল্পে আইন এবং সামাজিক ব্যবস্থার যথোচিত পরিবর্তন করা হোক।' আমার প্রস্তাব শুনেই তো সবাই ভীষণ চটে গেলেন। এযুগে নারীর প্রতি পুরুষের বিচার-অবিচারের কোন প্রশ্নই ওঠে না। আদিম কালে যখন নারীকে রক্ষা করবার জন্যে নরের দরকার হ'তো, তখন এসব যুক্তি চল্‌তো। এখন থানা রয়েছে, পুলিশ রয়েছে, পেনাল কোড রয়েছে—সুতরাং বিচার-অবিচারের কর্তা তো আর স্বামীরা নয়! একথার উত্তরে আমি বললুম, 'তাহলে আমি আর একটা সংশোধন প্রস্তাব করবো, অনুমতি দিন।' সভানেত্রী বললেন, আমাকে আর কোন সংশোধন প্রস্তাব করবার অনুমতি দেওয়া হবে না। আমি বললুম, 'আপনাদের প্রস্তাবের অর্থটা কি এই যে, পুরুষেরা যেমন সিগারেট খায়, লেমনেড খায়, ক্লাবে সারারাত আড্ডা দেয়, তেমনি মেয়েরাও—?' সভানেত্রী বল্‌লেন, 'ওসব ডিটেল্‌স্ পরে ঠিক করা যাবে। এত বড় সভায় ওসব খুঁটিনাটি আলোচনা করা চলে না।' আমি চুপ ক'রে রইলুম। প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হয়ে গেল। (আলো—৩০)

ড. বোস। ভেরি ইণ্টারেস্টিং! আচ্ছা, দ্বিতীয় প্রস্তাবটা কি?

ড. কর। দ্বিতীয় প্রস্তাব হলো, 'সন্তান-সন্ততির মধ্যে বৈধ এবং অবৈধ বলে কোন প্রভেদ থাকবে না।' আমি বললুম, 'একটা সংশোধন প্রস্তাব আন্‌তে পারি কি?' সভানেত্রী বল্‌লেন, 'হাঁ, একটা সংশোধন প্রস্তাবের অনুমতি দিতে পারি। কিন্তু তার বেশি নয়।' আমি

বললুম, 'আমি প্রস্তাব করি যে, সমাজ থেকে বিবাহ-ব্যাপারটা তুলে দেওয়া হোক।' শুনে সবাই ভয়ানক খাপ্পা! (আলো—২০)

মিসেস্ ভৌমিক। কেন বলুন তো?

ড. কর। আমার পাশে যাঁরা বসেছিলেন, তাঁরা বল্‌লেন, 'এ আমরা কিছুতেই সমর্থন কর্‌বো না। এ প্রস্তাব পাশ হ'লে আমরা জয়ঢাক ঘাড়ে কর্‌বার লোক কোথায় পাব?' আমাকে প্রস্তাব প্রত্যাহার কর্‌তে হ'ল। মূল প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হলো।

ড. বোস। এ প্রস্তাবটার ইম্‌প্লিকেশনটা কি, তা একবার আপনারা ভেবে দেখেছেন! (আলো—১৫)

ড. নন্দী। ভেবেই দেখুন, এখানে আর আলোচনায় কাজ নেই, আলো নিভে যাবে।

মিসেস্ ভৌমিক। না, না, আলো নিভিয়ে দেবেন না। আপনারা যাই বলুন, আমার তো মনে হয় ভারতীয় সভ্যতার কিংবা মানব-সভ্যতার জন্ম থেকে এ পর্য্যন্ত নারীর নিজের মুখে এমন র‍্যাশন্যাল প্রস্তাব এ পর্য্যন্ত শোনা যায় নি।

ড. বোস। মানে, ব্যাক্ টু নেচার!

মিসেস্ ভৌমিক। বাট্ র‍্যাশন্যলি অ্যাণ্ড লজিক্যালি।

ড. মুখার্জি। এটা কিন্তু বড় বাড়াবাড়ি হচ্ছে। এরকম আইডিয়া সাধারণের মধ্যে প্রচার করাটা অত্যন্ত অন্যায়।

ড. নন্দী। আমারও তাই মত। আমার মনে হয়, প্রথম বিলাতী সভ্যতার ধাক্কায় যেমন বাঙ্গালী পুরুষগুলোর মাথা ঠিক ছিল না, এখন তেমনি উচ্চশিক্ষা এবং নারী-প্রগতির একটা আচমকা ধাক্কা এসে আমাদের ছেলেমেয়েদের মাথা গুলিয়ে দিচ্ছে। স্বাধীনতা আর উচ্ছৃঙ্খলতার ভেদরেখা এরা মান্‌তে চায় না। (আলো—৩০)

মিসেস ভৌমিক। (তড়াক্ করিয়া চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিয়া)। ঐ-য্-যাঃ—

ড. নন্দী। কি হ'ল?

ড. বোস। ছারপোকা বুঝি?

ড. চক্রবর্তী। আপনার হ্যাণ্ড্ব্যাগ হারিয়েছে বুঝি?

মিসেস্ ভৌমিক। না, না, ওসব কিছু না। আজ পাঞ্জাব মেলে উনি রাওলপিণ্ডি যাচ্ছেন, স্টেশনে সী-অফ্ করতে যাবার কথা ছিল—স্রেফ্ ভুলে গেছি। (হাতের ঘড়ির দিকে চাহিয়া) এখনও বোধ হয় সময় আছে। আচ্ছা, আজ আসি।

নিষ্ক্রান্ত

ড. কর। আজ তো ডঃ দাসের একটা কবিতা পড়ার কথা ছিল। কই, পড়লেন না তো!

মিস্ চ্যাটার্জি। থাক্, ওঁর আর কবিতা পড়ে কাজ নেই। আমার একটুও ভাল লাগে না।

ড. নন্দী। কেন বলুন তো?

মিস্ চ্যাটার্জি। উনি বড্ড শিগগির শেষ ক'রে ফেলেন।

মিসেস নন্দী। যা বলেছ, একটু ভাব না জম্‌লে কি কবিতা ভাল লাগে? (আলো—২০)

ড. ভট্টচার্য। এক্স্‌কিউজ মি, দেখুন আমাকে আজ একটু সকাল সকাল বাড়ী ফিরতে হবে।

ড. মুখার্জি। কেন বলুন তো?

ড. ভট্টাচার্য। আজ আটটা সাতান্ন মিনিটে চন্দ্রগ্রহণ। তার আগেই খাওয়া-দাওয়া শেষ করতে হবে। হাঁড়ি-কুড়িগুলো সব ফেলে দিতে হবে তো—

মিস্ চ্যাটার্জি। আপনিও এসব মানেন নাকি? আপনিই না অ্যাস্ট্রনমিতে গবেষণা করেছেন?

ড. ভট্টাচার্য। মানে, কথাটা কি জানেন, সবই কি আর আজকালকার সায়েন্স দিয়ে বোঝা যায়? দেয়ার্ আর্ মোর থিঙ্স্ ইন হেভ্ন্ অ্যাণ্ড্ আর্থ, হরেশিও, ছ্যান্ আর্ ড্রেম্ট্ অফ্ ইন্ ইওর ফিলজফি—বুঝলেন কি না।

ড. বোস। হ্যাঁ, বুঝেছি। মানে, ট্রায়াম্ফ্ অফ্ র‍্যাশনালিজ্‌ম্ আর কি!

ড. ভট্টাচার্য। তা ঠাট্টা করতে হয় করুন। আমি তো আর বিজ্ঞানে রিসার্চ ক'রে নাস্তিক হ'য়ে যাইনি।

ড. বোস। গ্রহণে হাঁড়ি ফেলার সঙ্গে নাস্তিকতা বা আস্তিকতার সম্বন্ধটা ঠিক বোঝা গেল না।

ড. ভট্টাচার্য। সবাই সব জিনিষ বোঝে না, ডঃ বোস।

ড. বোস। আজ্ঞে না। (আলো—৩০)

ড. ভট্টাচার্য। আচ্ছা আসি তা হ'লে। নমস্কার!

নিষ্ক্রান্ত

ড. মিটার। দেখুন, আমাকে আজ একটু শিগ্‌গিরই যেতে হবে।

ড. নন্দী। আপনারও কি গ্রহণ-সমস্যা নাকি?

ড. মিটার। আজ্ঞে না। আমার প্রয়োজনটা আরো আর্জেণ্ট।

মিস্ চ্যাটার্জি। ব্যাপার কি?

ড. মিটার। (পেণ্টুলনের পকেট হইতে একটি দুইড্রাম হোমিও-প্যাথিক ঔষধের খালি শিশি বাহির করিয়া) এই দেখুন, আমাকে একবার যেতে হবে ঠনঠনের কালীবাড়ী। মা-কালীর চরণামৃত একটু নিয়ে গিয়ে খাওয়াতে হবে আমার ভাইঝিকে—

ড. দাস। কি আশ্চর্য! আপনি আবার ওসব—

ড. মিটার। আজ্ঞে, মানে—আমি ওসব মানিনে। তবে মেয়েদের ব্যাপার কি না, মানে—তাছাড়া কিসে কি হয় বলা তো যায় না। দেয়ার আর মোর থিংস্ ইন হেভেন্ অ্যাণ্ড আর্থ—

ড বোস। তা তো বটেই! (আলো—৩০)

ড. মিটার। আচ্ছা, আজ উঠি। নমস্কার!

ড. সিংহ। দেখুন, আমাকেও একটু আগেই যেতে হচ্ছে।

ড. কর। কেন, আপনার আবার কি হ'ল?

ড. সিংহ। ভাবছিলুম, একবার থিয়েটারে যাব। প্রায় দুবছর থিয়েটার দেখিনি।

ড. পালিত। থিয়েটার! দেখুন, কিছু মনে করবেন না। আমার মনে হয়, এ মজলিসের সভ্যদের এসব মিডীভ্যাল আমোদচর্চায় যোগ দেওয়া মানায় না। এ দেশের থিয়েটারের ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল এবং কাল্‌চারাল লেভেল বড় নীচু।

ড. সিংহ। আমি অবশ্য অতটা সিরিয়াস্‌লি ভেবে দেখিনি। একটু সময় কাটানো—দু-চারটে গান-টান শোনা—দু-একটা হাসি-রসিকতা—মন্দ কি! চলুন না, আপনিও।

ড. পালিত। আমি? কি যে বলেন! আমি ও ধরণের আমোদ একেবারেই পছন্দ করি নে। তাছাড়া, আজ আমার একটা খুব দরকারী এন্‌গেজমেণ্ট আছে। শুধু আজ নয়, এ সপ্তাহের সবগুলি সন্ধ্যাই এক রকম বুক্‌ড্!

ড. সিংহ। কি এত এন্‌গেজমেণ্ট আপনার?

ড. পালিত। আজ মিসেস্ গাঙ্গুলীর বাড়ীতে ছাত্রছাত্রীদের উদ্দাম

নাচ, কাল মিঃ ভূঁইয়ার বাড়ীতে মায়েদের এবং মেয়েদের সাঁওতালী নাচ, পরশু ডঃ বাড়রীর বাড়ীতে মিক্স্‌ড ব্রীজ, তারপর দিন খিচুড়ী-ক্লাবের প্রীতি-ভোজ, তারপর দিন কাজিন ক্লাবের বাৎসরিক উৎসব, তারপর দিন— (আলো—২০)

ড. সিংহ। থাক্, আর বলতে হবে না। আপনার থিয়েটার-বিরাগের কারণ বোঝা গেল।

ড. পালিত। আপনাদের মন অত্যন্ত—। যাক্‌গে, আচ্ছা আজ আসি তাহলে। নমস্কার!

নিষ্ক্রান্ত

ড. দাস। আমাকেও এবার উঠতে হ'ল।

ড. নন্দী। এখনই?

ড. দাস। হ্যাঁ।

ড. নন্দী। কোথায় যাবেন এখন?

ড. দাস। যাব ফারপোতে। কয়েকটি ফিরিঙ্গী মেয়ে আসবেন, তাঁদের সঙ্গে একটা সময় ঠিক করতে হবে। ওকি? আলো কমে কেন?

ড. নন্দী। অন্ এ পয়েণ্ট অব অর্ডার! এ মজলিসে ওসব আলোচনা চল্‌বে না। (আলো—৫)

ড. দাস। সাট্ আপ্ প্লিজ। এই রকম নীচ আর সন্দিগ্ধ মন নিয়ে আপনি মজলিসের বিবেক রক্ষা করবেন? শিগগির আলো বাড়িয়ে দিন।

ড. নন্দী। তা দিচ্ছি। কিন্তু আপনার ওই কথাগুলোর একটা র‍্যাশন্যাল এবং কালচারাল ইন্‌টারপ্রিটেশন চাই।

ড. দাস। তা দিচ্ছি। ওঁয়ারা আমার ভাগ্নের বিয়ের বরযাত্রী। কবে কখন কোথা থেকে রওয়ানা হয়ে কোথায় যাবেন তাই ঠিক করবার

৩

জন্য ফারপোয় যাচ্ছি! ওঁয়ারা তো আর আমাদের পাড়ায় বেশি যাতায়াত করেন না! আচ্ছা, আসি তা হ'লে। নমস্কার! গুড্ নাইট্ টু এভ্রিবডি।

নিষ্ক্রান্ত

ড. ঘোষ। এক্স্কিউজ্ মি, আমিও এবার উঠব।

মিস্ ঘোষ। কেন? এত সকালেই যে! মিসেসের হুকুম বুঝি? (আলো—৩০)

ড. ঘোষ। না না, ওসব কিছু না। আমাকে একবার যেতে হবে হ্যারিসন রোডে। সেণ্ট্রাল অ্যাভেনিউ-এর মোড়ে একটা পশ্চিমা সাধুর কাছে অম্বলের অসুখের মাতুলী পাওয়া যায়। দিনের বেলায় যেতে লজ্জা করে। ভাবছি, বাড়ী ফিরবার পথে নিয়ে যাব।

মিস্ ঘোষ। আপনি আবার মাতুলীও বিশ্বাস করেন নাকি?

ড. ঘোষ। বিশ্বাস আমি করিনে। তবে মেয়েদের ব্যাপার—মন জুগিয়ে চলাই ভাল। তাছাড়া কিসের কি গুণ, বলা তো যায় না। দেয়ার আর মোর থিংস্ ইন হেভ্ন অ্যাণ্ড আর্থ—

ড. বোস। ট্রায়াম্ফ্ অফ্ র‍্যাশান্যালিজম্!

ড. ঘোষ। অমন ঠাট্টা সবাই করে। আবার অবস্থার ফেরে পড়ে মত বদ্লাতেও দেরি হয় না।

ড. বোস। তা তো বটেই—বিশেষত আল্ট্রার‍্যাডিক্যালদের।

ড. ঘোষ। আচ্ছা, আসি তা হ'লে। বেশি দেরি হ'লে আবার সে ব্যাটাকে পাওয়া যাবে না। গুড নাইট্।

নিষ্ক্রান্ত

ড. ব্যানার্জি। আমিও ভাবছি, এখন উঠলে হয়।

ড. নন্দী। আপনিও?

ড. ব্যানার্জি। হ্যাঁ। আমাকে একবার যেতে হবে এক পণ্ডিতের কাছে—একখানা কোষ্ঠীর সম্বন্ধে খোঁজ করতে।

ড. মুখার্জি। কোষ্ঠী? (আলো—৩০)

ড. ব্যানার্জি। হ্যাঁ, একখানা ঠিকুজী দিয়েছি, তাই থেকে কোষ্ঠী তৈরি কর্‌তে হবে। একটি মেয়ের সঙ্গে আমার ভাইপোর বিয়ে ঠিক হয়েছে। সবই ঠিক, কিন্তু কোষ্ঠীটা নিয়ে একটু গোলযোগ বেধেছে।

ড. মুখার্জি। আজকালকার দিনে ওসব আবার আছে না কি? বিশেষত আপনার মত একজন আধুনিক র‍্যাশন্যাল র‍্যাডিক্যাল লোকের পক্ষে—

ড. ব্যানার্জি। মানে, আসল কথাটা কি জানেন, আমরা মুখে বা মিটিং-এ যতটা র‍্যাশন্যাল, মনে তা নই। তাছাড়া এই যে আমাদের জ্যোতিষ-শাস্ত্র—এটা যে একেবারে ভুয়ো—তাই বা বলি কি করে?

ড বোস। মানে, র‍্যাশন্যালিজম্‌টা একটা ধাপ্পা!

ড. ব্যানার্জি। অতটা মান্‌তে আমি রাজী নই।

ড. বোস। সেটা আরও খারাপ! মানে, সুবিধা বুঝে মানি। আমি ত দেখেছি, যখন দরে বনিবনাও না হয়, তখন কোষ্ঠীর তলব পড়ে। আবার যখন দরদস্তরটা বেশ সুবিধা মত হয়ে যায়, তখন জ্যোতিষীকে পাঁচসিকে দিলেই আবার রাজযোটক হতেও দেরি লাগে না।

ড. ব্যানার্জি। আপনার সব বিষয়েই একটা সিনিক্যাল এবং স্যাটিরিক্যাল ভাব; এটা কিন্তু আমার মোটেই পছন্দ হয় না।

ড. বোস। বেশ, ব'লব না! ঠিকুজি-কোষ্ঠী বা যা-খুশী দেখে আপনার ভাইপোর বিয়ে দিন। আন্তরিক আশীর্বাদ রইল।

ড. ব্যানার্জি। থ্যাঙ্কস্‌। আমারও অনুরোধ রইল, আপনি ওসব জিনিষকে অত বাজে মনে কর্‌বেন না। আমাদের বর্তমান যুগের

লেবরেটরীর বাইরে যে আর কোনও সত্য নেই, তা আমি বিশ্বাস করি না। দেয়ার আর মোর থিংস্ ইন হেভ্ন্ অ্যাণ্ড আর্থ—

ড. বোস। নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই। আমাদের আল্‌ট্রারয়্যাডিক্যালদের অনেকের মুখেই তো ওই কথাই শুনলুম।

ড. ব্যানার্জি। আচ্ছা, আজ উঠি। কোষ্ঠীটার একটা হেস্তনেস্ত না হওয়া পর্যন্ত পাকা দেখাটা হয়ে উঠছে না। আচ্ছা, নমস্কার!

নিষ্ক্রান্ত

ড. রুদ্র। আই অ্যাম্ অ্যাফ্রেড, আই শুড্ লীভ নাউ!

ড. নন্দী। আপনারও কি ঠিকুজী-সমস্যা নাকি?

ড. রুদ্র। আজ্ঞে না। আমাকে এখুনি একবার যেতে হবে বাগবাজারে। আমার এক ভাগ্নে একটা বামুনের মেয়েকে বিয়ে কর্‌তে চায়। যেমন ক'রে হোক, তাকে নিরস্ত করতে হবে।

ড. বোস। কেন? যদি মেয়ের পক্ষের মত থাকে, তবে আপনি কেন বারণ কর্‌বেন?

ড. রুদ্র। দেখুন, র্যাশন্যালই হই আর র্যাডিক্যালই হই, আমাদের পারিবারিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ কর্‌তে দিতে পারিনে।

ড. বোস। আমার মনে হয়, এসব ব্যাপারে পারিবারিক মর্যাদার আদর্শটা পরিবর্তন করবার সময় এসেছে। উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুর মধ্যেও যদি এই সংকীর্ণ কুলিনীয়ানা না যায়, তা হলে কেমন ক'রে আমরা আশা কর্‌ব যে আমরা সবাই সবাইকে একজাতিভুক্ত মনে কর্‌ব?

ড. রুদ্র। বুঝি তো সবই, কিন্তু দেখুন, কিছু বুদ্ধি দিয়ে বোঝা আর কাজে করা, এদুটোর মধ্যে তফাৎ অনেক।

ড. বোস। অশিক্ষিত, আন্‌কালচার্ড লোকের কাছে এ তফাৎ যত

বেশি, আমাদের মত র‍্যাশন্যাল লোকদের কাছে অত বেশি হওয়া উচিত নয়।

ড. রুদ্র। তা ঠিক। তবে কি জানেন, পুরুষপরম্পরা থেকে পাওয়া পারিবারিক ট্রাডিশন—

ড. বোস। একেই বলে ট্রায়াম্ফ্ অফ্ র‍্যাশন্যালিজ্ম্!

ড. রুদ্র। ঠাট্টাই করুন আর যাই করুন, আমি বামুন-কায়েতের বিয়েতে কিছুতেই মত দেবো না।

ড. বোস। নিশ্চয়ই না।

ড. রুদ্র। আচ্ছা, আসি তা হ'লে। দেখি, কতদূর ব্যাপারটা গড়িয়েছে। তাই বুঝে ব্যবস্থা কর্‌তে হবে। আচ্ছা, নমস্কার!

নিষ্ক্রান্ত

ড. পুরকায়স্থ। আমাকে কিন্তু একটু এক্স্‌কিউজ করতে হবে।

ড. বোস। আপনার এখন কি কাজ? কোন গণৎকারের কাছে হাত দেখাতে যাবেন না কি? (আলো—২৫)

ড. পুরকায়স্থ। না না, ওসব বুজরুকিতে আমার বিশ্বাস নেই।

মিস্ চ্যাটার্জি। তবু ভাল, অন্তত একজন র‍্যাশন্যাল লোক এখানে আছেন, যিনি এসব বুজরুকি বিশ্বাস করেন না।

ড. নন্দী। বুজরুকি আমরা কেউই বিশ্বাস করি না। যে সব ব্যাপার আমাদের মধ্যে কারো কারো কাছে বুজরুকি বলে মনে হয়, হয়তো তার মধ্যে খানিকটা সত্যও থাকৃতে পারে।

ড. মুখার্জি। সত্য আছে কি-না—সেটা ভাল ক'রে না জেনে শুধু শ্রদ্ধা ভক্তি আর বিশ্বাসের দোহাই দিয়ে যা-তা করা আর যা-তা মানা—এটা তো র‍্যাশন্যালিজ্ম্ নয়!

ড. বোস। ঠিকুজী, কোষ্ঠী, হাত-দেখা, এসবেরও অনেক র‍্যাশন্যাল ব্যাখ্যা আছে হয় তো!

ড. মুখার্জি। তা হ'লে তো জগতে বা সমাজে অযৌক্তিক বলে কিছুই থাকতে পারে না। সব কিছুরই একটা র‍্যাশন্যাল ব্যাখ্যা খাড়া করা যায়।

ড. বোস। তা যায় বলেই তো সবাই নিজেকে র‍্যাশন্যাল মনে করে; আর সেই জন্যই সব রকম অন্ধ সংস্কার আমাদের পেয়ে বসে।

ড. সিংহ। কিন্তু আমাদের মজলিসের সভ্যেরা তো সে লেভেলের লোক নন। এঁদের মন কখনো ওসব অন্ধ সংস্কারে আবদ্ধ হ'তে পারে না।

ড. বোস। তবে কি না, দেয়ার আর মোর থিংস্ ইন্ হেভ্ন্ অ্যাণ্ড্ আর্থ—

ড. পুরকায়স্থ। তা হ'লে আমি উঠি এবার।

মিসেস্ নন্দী। আচ্ছা আসুন! আপনার স্ত্রী তো সবে আজ নাসিক থেকে এসেছেন। বিয়ের পর এই বোধ হয় আপনাদের প্রথম দেখা।

মিস্ চ্যাটার্জি। তাই নাকি? কি আশ্চর্য! আর আজ আপনি এখনো মজলিসে বসে আছেন? ও, আপনিই তো 'ট্রায়াম্ফ্ অফ্ র‍্যাশন্যালিজ্ম্' লিখেছেন, তাই আপনার অত সেন্টিমেণ্টালিটি নেই। কি বলেন?

ড. পুরকায়স্থ। হ্যাঁ, তা কতকটা বটে। তবে আমি এখন উঠ্‌ছি একটু অন্য প্রয়োজনে। অবশ্য প্রচার করবার মত কিছু নয়, তবে কি না, বিটুইন্ আওয়ারসেল্‌ভ্‌স্— (আলো—২০)

মিসেস নন্দী। হ্যাঁ, তা বেশ তো—বলুন না। আমরা তো আর—

ড. পুরকায়স্থ। না না, তা তো বটেই। আপনারা তো আর—। মানে, আমার বাড়ীতে গুরুদেব আস্‌বেন। (আলো—১০)

ড. বোস। এই রাত্রে !

ড. পুরকায়স্থ। আমার জীবনের একটা প্রধান ব্রত এই যে, কোন কিছু নিজে গ্রহণ করবার আগে গুরুদেবকে নিবেদন করি। যখন বাজারে প্রথম আম ওঠে, প্রথমে গুরুদেবকে অর্পণ ক'রে পরে আমি খাই। যখন শীতের দিনে সোয়েটার পরি, তখন আগে গুরুদেবকে একটি সোয়েটার পরিয়ে তবে সেটা আমি পরি। এমনি সব বিষয়েই—

ড. বোস। অ্যানাদার ট্রায়াম্ফ অফ্ র‍্যাশন্যালিজ্‌ম্ !

ড. পুরকায়স্থ। আপনাদের হয়তো এ জিনিষটা তেমন অ্যাপীল করছে না। কিন্তু, দেয়ার আর মোর থিংস্ ইন্ হেভ্‌ন্ অ্যাণ্ড আর্থ—

ড. বোস। যে আজ্ঞে ! (আলো—৫)

ড. পুরকায়স্থ। আচ্ছা, আসি তা হ'লে। নমস্কার !

নিষ্ক্রান্ত

মজলিসস্থ সকলেই কিছুক্ষণ গালে হাত দিয়া তন্ময় হইয়া কি যেন ভাবিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে ডঃ নন্দী বলিলেন, আজ মজলিসটা এখানেই শেষ হোক্। সকলেই সম্মতি জ্ঞাপন করলেন এবং ধীরে ধীরে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। (আলো—১০০)

অক্টোবর, ১৯৪০

শ্লেট

চূড়ামণি যোগ। বৃদ্ধ দাদামহাশয় কলিকাতায় আসিয়াছেন এবং মেয়ের বাড়িতেই উঠিয়াছেন।

বহুকাল পরে কলিকাতায় আসা। সুতরাং গঙ্গাস্নান নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গেলেও কিছুদিন থাকিয়া গেলেন। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, চিড়িয়াখানা, যাদুঘর, বালি ব্রীজ, পরেশনাথের মন্দির, লেক প্রভৃতি সবই এক এক করিয়া দেখিয়া আসিয়াছেন। নূতন নূতন বড় বড় রাস্তা দেখিয়া বহুপূর্বের পরিচিত অনেক স্থান চিনিতেই পারিলেন না। নাতি-নাতনিদিগকে উপলক্ষ করিয়া একটা টকি দেখিয়া আসিয়াছেন এবং যথারীতি 'ছি ছি'ও করিয়াছেন।

একদিন দুপুরে আহারান্তে মেয়ে আসিয়া বলিলেন—বাবা, ছেলে-মেয়েদের নিয়ে একটু বাগবাজার যাচ্ছি, শুধু খোকা বাড়িতে রইল। ওর সর্দি হয়েছে, ওকে আর নিয়ে যাব না, শীগ্‌গিরই ফিরে আস্‌ব। না গেলে দিদি অসন্তুষ্ট হবে। তুমি খোকাকে একটু দেখো।

—আচ্ছা।

বৃদ্ধ দাদু নাতিকে ডাকিয়া বিছানার পাশে বসাইলেন। মেয়ে সদলবলে বাহির হইয়া গেলেন। খোকা ঘোর আপত্তি জানাইল, কিন্তু বল, বেলুন, মোটরগাড়ী, প্রভৃতি পাইয়া অনেকটা শান্ত হইল। আহারান্তে দাদুর একটু দিবানিদ্রার অভ্যাস ছিল। খোকা খাটের উপর মোটরগাড়ী চালাইতে লাগিল এবং দাদু একটু তন্দ্রাভিভূত হইলেন।

খানিক পরে একটা শব্দ শুনিয়া দাদু ধড়মড় করিয়া জাগিয়া উঠিলেন। প্রথমটা মনে করিলেন, একটার তোপ। কিন্তু পরক্ষণেই দেখিলেন পাশের ঘরে টেবিলের পাশে একটা পিছন-খোলা ঝরণা কলম হাতে খোকা দাঁড়াইয়া আছে এবং পাশেই মেঝেয় ভাঙ্গা কাঁচের টুকরা এবং এক রাশ কালি ছড়াইয়া আছে। টেবিলের পাশে কালির দোয়াত রাখিয়া ঝরণা কলমে কালি ভরিবার চেষ্টাতেই এই বিভ্রাট ঘটিয়াছে। খোকা অপ্রতিভ। ততোধিক অপ্রতিভ দাদু, কারণ, তাঁহার নিকট গচ্ছিত খোকা-ধন তিনি এক ঘণ্টাও নিরাপদে রাখিতে পারিলেন না। দাদু দিবানিদ্রার আশা ত্যাগ করিয়া পুনরায় খোকাকে নিজের খাটের উপর আনিয়া বসাইলেন এবং স্থির হইয়া থাকিতে উপদেশ দিলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিলেন যে খোকাকে স্থির হইতে বলার কোন মানে হয় না। তখন তিনি গম্ভীর ভাবে বলিলেন, খোকা, নিয়ে এস তো তোমার শ্লেট পেন্সিল।

—কি আন্‌ব ?

—শ্লেট—আর—পেন্সিল।

—ছেলেট কি দাদু ?

—শ্লেট কি তা জান না ?

—ছেলেট—? সে কি দাদু ?

—ঐ যে পাথরের চৌকা—

—ও, যাতে মসলা বাটে—? সে তো বেজায় ভারি, কেমন ক'রে আনব ?

—না, না, তা নয়। ঐ যে কালো, পালিশ চৌকো পাথর—

—ও, বুঝেছি। আমাদের ঠাকুর ঘরের মেঝেয় সাদা কালো পালিশ পাথর বসান আছে। কিন্তু, সে তো তুলে আনা যায় না।

—নাঃ, মাটি করলে। তোরা শ্লেট দেখিস নি কখনো—আশ্চর্য !

দাদু নিরুপায় হইয়া বাড়ির চাকরকে ডাকিলেন এবং বাজার হইতে একখানি শ্লেট ও দুইটি পেন্সিল কিনিয়া আনাইলেন। তারপর নাতিকে তাহাতে কিরূপে লিখিতে হয়, কিরূপে মুছিতে হয় প্রভৃতি দেখাইয়া দিলেন। নূতন জিনিস পাইয়া খোকা তন্ময় হইয়া লেখা পড়ায় মন দিল। দাদু নিশ্চিন্ত হইলেন, কিন্তু ঘুমাইবার আর চেষ্টা করিলেন না।

একটু পরেই মেয়ে সদলবলে ফিরিয়া আসিলেন এবং তাঁর বাবার সঙ্গে দিদির বাড়ির গল্প জুড়িয়া দিলেন। খোকা এক লাফে গিয়া ভাই বোনদের সঙ্গে মিশিয়া গেল।

কথার ফাঁকে দাদু মেয়েকে বলিলেন, তোর ছেলেমেয়েরা শ্লেট চেনে না, কি আশ্চর্য !

—আশ্চর্য আর কি ? পাততাড়ি তো অনেক আগেই উঠে গেছে। এখন শ্লেটও প্রায় অচল। ওদের হাতেখড়িই হল ঝরণা কলম আর এই মোটা এক্সারসাইজ বুকে। শ্লেট একে তো ভারি, তায় আবার ভিজে নেকড়া দিয়ে মুছতে হয়। ওসব সেকেলে ব্যাপার কি আর এখন চলে ?

ইতিমধ্যে দাদু সবিস্ময়ে দেখিলেন, খোকা তার নূতন শ্লেটখানি ভাঙা চৌচির অবস্থায় আনিয়া তাঁহার সামনে ধরিল। দাদু বলিলেন, খোকা, শ্লেটখানা এমন করে ভাঙলে কে ?

—আমি কি জানি ? মণ্টু এখানা পেতে বসে বিস্কুট খাচ্ছিল, মনে করেছে, একখানা পিঁড়ি।

দাদু বিশেষ কিছুই বলিলেন না, কেবলমাত্র খোকনের হাত হইতে ভাঙা শ্লেটখানা লইয়া টান মারিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিলেন।

ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৯

খোকা

১

খোকাটা যেন কি!

আমাকে একেবারেই ভালবাসে না। আমি যে তার জন্য কত ভাবি, তা একটুও বোঝে না। কথায় আছে, স্নেহ নিম্নগামী। কিন্তু তাই বলিয়া একটুও কি উপরের দিকে উঠিতে নাই!

এই তো সেদিন উহার জন্য এমন সুন্দর খেলনা আনিয়া দিলাম। খেলনাটা হাতে লইয়াই ছুটিয়া পলাইল; কই, একটু কৃতজ্ঞতাও তো প্রকাশ করিল না! অতটুকু ছেলে আবার কৃতজ্ঞতা কি দেখাইবে? কেন, কিছু চাহিয়া না পাইলে দুঃখ আছে, রাগ আছে, অভিমান আছে, অথচ কিছু পাইলে কৃতজ্ঞতা নাই, এ কেমন কথা?

সেদিন একখানা ছবির বই কিনিয়া আনিয়া খোকার হাতে দিয়া বলিলাম, এখানে ব'সে ছবি দেখ তো। খাটের উপর পা ঝুলাইয়া বসিল বটে, কিন্তু কয়েক মুহূর্তের জন্য মাত্র। খাট হইতে লাফ দিয়া নামিয়া একছুটে তাহার মাতা-ঠাকুরাণী যেখানে বসিয়া তরকারি কুটিতেছিলেন, সেখানে গিয়া বসিয়া তরকারির চুপড়ির উপর বই রাখিয়া মনোযোগ দিয়া খোকা ছবি দেখিতে লাগিল।

এক কৌটা লোজেঞ্জ আনিয়া দিলাম। কত বলিলাম, এখানে ব'স সবাইকে ডাকি, সবাই ভাগ ক'রে নাও। খোকার সবুর সয় না। কৌটা লইয়া ছুটিয়া মার কাছে চলিয়া গেল। তিনিই ভাগ-বাটোয়ারা

করিলেন। মহানন্দে ছুটাছুটি লাফালাফি চলিতে লাগিল। কিন্তু কই, আমার খোঁজ তো করিল না!

খোকার জন্য মোজা আসিয়াছে, জুতা আসিয়াছে, শার্ট আসিয়াছে, প্যাণ্ট আসিয়াছে, অর্থাৎ আমিই কিনিয়া আনিয়াছি। সব পাইয়া খোকা মহা খুশি, নাচিয়া কুঁদিয়া সবাইকে নূতন জামা দেখাইতেছে, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেছে, বাবা দিয়াছে; কিন্তু ঐ পর্যন্ত। কই, আমার কাছে আসিয়া তো একটু কিছুই করিল না, যাহাতে আমার প্রতি ওর—কৃতজ্ঞতা নাই হইল—একটু স্নেহের চিহ্ন প্রকাশ পায়!

কি আশ্চর্য!

২

দরকারি কাজ। দিল্লী যাইতে হইবে। বিছানা, স্যুট্‌কেস গুছানো হইয়াছে। ঈজি-চেয়ারে বসিয়া সিগারেট খাইতেছি এবং টাইম-টেব্‌লের পাতা উল্টাইতেছি। পাশের ঘরের দরজার কাছে বসিয়া গৃহিণী একটি কৌটায় আমার জন্য মশলা গুছাইতেছেন।

টাইম-টেব্‌লের আড়াল হইতে দেখিলাম, খোকা কোথা হইতে ছুটিয়া আসিল এবং স্যুট্‌কেস ও বিছানার দিকে চাহিয়া রহিল। একটু পরে তাহার মাতা-ঠাকুরাণীকে জিজ্ঞাসা করিল, বাক্স বিছানা কি হবে মা?

উনি দিল্লী যাবেন কিনা, তাই সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

ও! গাড়ি চ'ড়ে যাবেন?

হ্যাঁ, রেলগাড়ি চ'ড়ে ঝিকঝিক ক'রে অনেক দূর যাবেন।

খোকা হঠাৎ গম্ভীর হইয়া উঠিল। একটু পরে বলিল, বাবা চ'লে গেলে আমরা একা থাকব?

বাবা চলিয়া গেলে বাড়িটা একা হইয়া যায়, এ কথা খোকাকে কে শিখাইল? মাতা-ঠাকুরাণী বলিলেন, একা কেন থাকব? পিসীমা থাকবে, মণ্টু থাকবে, ঝণ্টু থাকবে, ঠাকুর থাকবে, চাকর থাকবে।

ও!

খোকা যেমন এক লাফে আসিয়াছিল, তেমনই আর এক লাফে ঘরের বাহির হইয়া গেল। কিন্তু একটু পরেই আবার ফিরিয়া আসিল। একটু বসিয়াই বলিল, মা, আমি রেলগাড়ি যাব।

উনি যাচ্ছেন দরকারি কাজে, তুই কোথায় যাবি?

আমিও দক্‌কারি যাব।

বেশ তো, যা না। আমি কিন্তু যাব না।

তাহ'লে আমি যাব না।

খোকা আবার বাহির হইয়া গেল। একটু পরে নীচে একটা যুদ্ধের গোলমাল শুনিতে পাইলাম। গৃহিণী ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া গেলেন। ফিরিয়া আসিয়া জানাইলেন, মণ্টুটা এক ঠোঙা চিনাবাদাম আনিয়াছিল, তাহার ভাগ লইয়া গোলযোগের সৃষ্টি হয়। খোকা তাহা হইতে আস্ত দুইটি চিনাবাদাম আদায় করিয়া লইয়া তবে নিরস্ত হইয়াছে।

গৃহিণী মসলার কৌটা বন্ধ করিতেছেন, এমন সময়ে খোকা আবার ছুটিয়া আসিয়াছে। মাতা-ঠাকুরাণীকে জিজ্ঞাসা করিল, বাবা একা যাবে?

হ্যাঁ।

ঠাকুর সঙ্গে যাবে?

না, ঠাকুর যাবে কেন?

তা হ'লে বাবাকে রেঁধে দেবে কে? বাবা কি খাবে?

রেলগাড়িতে খাবার পাওয়া যায়, তাই খাবেন।

ও!

অন্য দিন খোকা সন্ধ্যা না হইতেই ঘুমাইয়া পড়ে, আজ খোকা শুধু এ ঘর, ও ঘর করিতেছে। স্যুটকেস, বিছানা, জলের কুজা, ছাতা ও টুপি লইয়া যখন ট্যাক্সিতে উঠিলাম, তখনও খোকা গম্ভীর হইয়া দরজায় দাঁড়াইয়া।

ট্রেন ছাড়িয়াছে। হোল্ড-অলটা খুলিয়া বিছানা পাতিতে যাইতেই দেখি, একটি ছোট কাগজের মোড়ক টুপ করিয়া মেঝেয় গিয়া পড়িল। তুলিয়া খুলিয়া দেখি, তাহার মধ্যে দুইটি চিনাবাদাম। বুঝিলাম, ঠাকুর সঙ্গে আসে নাই, ট্রেনে আমার ক্ষুধা পাইলে ভাত রাঁধিয়া দিবার লোক নাই। তাই আমার খোকামণি আমার জন্য দুইটি চিনাবাদাম কাগজে মুড়িয়া হোল্ড-অলের মধ্যে গুঁজিয়া দিয়াছেন।

কি আশ্চর্য!

মে, ১৯৪০

পান

ভজহরি বেকার।

ভজহরি বিনামূল্যে শব বহিয়াছে, ধাঙ্গড়-স্ট্রাইকের সময়ে রাস্তা পরিষ্কার করিয়াছে, ইলেক্‌শনের সময়ে একটি সিকি এবং একখানি কাট্‌লেটের বিনিময়ে লরির উপরে মেগাফোন-হাতে, ভোট ফর—করিয়াছে, বেকার-সমিতির সম্পাদকত্ব করিয়াছে, কিন্তু কিছুতেই বেকারত্ব ঘোচে নাই। মেস হইতে মেসান্তরে, হোটেল হইতে হোটেলান্তরে ঘুরিয়াছে, ফ্রেণ্ডস চার্জ বাকি পড়িয়াছে, জামার বোতাম পড়িয়া গিয়াছে, দাড়ি গোঁফ বড় হইয়াছে, জুতায় পট্টি লাগিয়াছে, তবু বেকারত্ব ঘোচে নাই।

মেছুয়াবাজারের একটি মেসে ভজহরি আপাতত থাকে। সারাদিন টো টো—রাত্রে একটু ঘুম। নেশার মধ্যে পান। সত্যই, ভজহরি ভীষণ পান খায়। অর্থাৎ একটা পান না খাইলে ভজহরির ঘুম আসে না।

মেসের পান সব দিন ভাগ্যে জোটে না। কোন দিন থাকেই না, কোন দিন ফুরাইয়া যায়। ভজহরি তাই খাওয়া-দাওয়ার পর একটি পয়সা সঙ্গে করিয়া রাস্তার মোড়ে যায়। সামনে যে দোকান পায়, সেখান হইতেই এক খিলি পান কিনিয়া খায়।

সেদিন রাত্রি প্রায় দশটা হইবে। ভজহরি মোড়ের একটি দোকানের পাশে গিয়া বলিল, এক পয়সার পান দাও তো—মিঠে পান।

পানওয়ালা কথা বলে না। সে আপন মনে সামনে সাজানো চেরা এবং আধ-চেরা পানের উপরে খয়েরের গোলা মাখাইতে লাগিল।

ভজহরি বলিল, এক পয়সার পান দাও।

কোন জবাব নাই। পানওয়ালা নির্বিকার চিত্তে পান সাজিতে লাগিল।

ভজহরি পুনরায় বলিল, এক পয়সার পান দাও না হে!

বলি, নিমাই চাটুজ্জে, না নিতাই মুখুজ্জে?

সে আবার কি? আমার নাম তো ভজহরি সরখেল। আমার নামে তোমার কি দরকার? পান এক পয়সার দেবে তো দাও।

তোমার নামের জন্য তো আমার ঘুমই হচ্ছে না। বলি, নিমাই চাটুজ্জে, না নিতাই মুখুজ্জে?

তোমার হেঁয়ালি রাখ। আর একদিন অবসরমত শুনব। আমার এখন ঘুম পাচ্ছে। দাও, এক পয়সার মিঠে পান দাও তো দেখি।

বলি, নিমাই চাটুজ্জে, না নিতাই মুখুজ্জে?

ভাল বিপদ তো! আমি বাপু, তোমার কথা কিছু বুঝতে পারছি না।

নাঃ, কিছু বুঝতে পারছেন না! ন্যাকা!

ভজহরি বড়ই মুস্কিলে পড়িল। এদিকে সারাদিনের ব্যর্থ পরিশ্রমের পর ঘুমে চোখ বুজিয়া আসিতেছে, ওদিকে সামনে সাজানো ছাঁচি, বাংলা, মিঠা, মাদ্রাজী, সাজা আর আধ-সাজা পানের রূপে, গন্ধে, রসে, জিভ লালায়িত হইয়া বার বার তালু স্পর্শ করিতেছে। ভজহরি চিন্তায় পড়িল—ব্যাপার কি? নিমাই চাটুজ্জে, নিতাই মুখুজ্জে? কোন দিন নামও তো শুনি নি! অথচ—ভগবান, কেন বেকার করলে? বেকারই যদি করলে, তবে বাঙালী করলে কেন? বাঙালীই যদি করলে, তবে একটু বুদ্ধি দিলে না কেন? আমি কি দুরভিসন্ধি নিয়ে পান কিনতে এসে ন্যাকা সেজে রয়েছি, তা এই সম্পূর্ণ অপরিচিত

পানওয়ালা জেনে বুঝে ফেলল, অথচ আমি নিজেই জানতে পারলুম না! এই বুদ্ধিটুকু নেই ব'লেই বোধ হয় বেকার হয়ে রয়েছি।

ভজহরি নিতান্ত বোকার মতই কিছুক্ষণ হাঁ করিয়া রহিল, দোকানদার অন্য খরিদ্দারের সঙ্গে কথা বলিতে লাগিল। দোকানদারের সহিত আর কথা বলিবার প্রবৃত্তি ভজহরির ছিল না। কিন্তু পান তো চাই। শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিবার জন্য ভজহরি আর একবার জিজ্ঞাসা করিল, নেহাতই পান দেবে না তা হ'লে? দোকানী কোন কথাই বলিল না। ভজহরি অগত্যা পথে পা বাড়াইল।

ফুটপাথের অপর পারে, গ্যাসের আলোর নীচে কয়েকজন বসিয়া তাস খেলিতেছিল। তাহাদের আকৃতিও প্রায় ভজহরি-জাতীয়। তাসগুলি ময়লা হইয়া এবং পাশগুলি ছিঁড়িয়া যে অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে দুই এক বার খেলিবার পর পিছন দিক হইতেই তাসগুলি চেনা যায়। ভজহরির পান-সমস্যা ইহারাও লক্ষ্য করিয়াছিল। যখন ভজহরি পানের দোকান হইতে চলিয়া যাইতেছিল, তাহাদের মধ্যে একজন তাহাকে ডাকিয়া বলিল, কি হয়েছে হে?

ভজহরি বলিল, এক পয়সার পান চাইলুম, তা বলে—নিমাই চাটুজ্জে, না নিতাই মুখুজ্জে! এসব হেঁয়ালি তো আমি বুঝতে পারলুম না।

ও, এই কথা। এদিকে এস, বুঝিয়ে দিচ্ছি। এ পাড়ায় দুটো দল আছে। একটা হচ্ছে, নিমাই চাটুজ্জের দল, আর একটা নিতাই মুখুজ্জের দল। এক দলের লোক অন্য দলের লোকের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখে না।

কিন্তু, মাত্র এক পয়সার পান—

এক পয়সাই হোক, আর এক লাখ টাকাই হোক, প্রিন্সিপ্‌ল ইজ প্রিন্সিপ্‌ল।

কিন্তু এটা তো একটা পানের দোকান।

দোকানই হোক আর যাই হোক, প্রিন্সিপ্‌ল ইজ প্রিন্সিপ্‌ল।

কিন্তু আমি তো কোন দলে নই।

থাকতেই হবে। ঐ যে ঐ ল্যাম্পপোস্টের পাশে একটা পানের দোকান, ওটা অন্য দলের।

ওখান থেকে তো একদিন পান কিনেছি।

অতএব প্রমাণ হয়ে গেছে, তুমি ঐ দলের।

প্রমাণ হয়ে গেল ?

হ্যাঁ, প্রমাণ হয়ে গেল। প্রমাণ যদি নাও হয়, তা হ'লে ধ'রে নেওয়া গেল, অনুমান ক'রে নেওয়া গেল, কল্পনা ক'রে নেওয়া গেল, মানে ঐ একই কথা।

কিন্তু আমি যদি কোন দলে না থাকতে চাই ?

থাকতেই হবে। পৃথিবী যেমন জল ও স্থলে বিভক্ত, তেমনই এ পাড়াটা নিতাই চাটুজ্জে আর নিমাই মুখুজ্জেতে বিভক্ত। একটাতে থাকতেই হবে। পড় নি ছেলেবেলায়, Man is a gregarious animal ? মানুষ কেন, পৃথিবীর সব জীবেরই দল আছে। বাঘের দল, ভালুকের দল, শেয়ালের দল—

বুঝেছি। তবে এই সব দল বাঁধার মধ্যে সামান্য একটু প্রভেদ আছে। কারও কারও দল বাঁধার পেছনে থাকে একটা instinct of self-preservation, আর কারও কারও দল বাঁধার পেছনে থাকে একটা instinct of suicide। যাকগে। তা হ'লে এ পানওয়ালা ?"

নিমাই চাটুজ্জে।

ভজহরি পুনরায় রাস্তা পার হইয়া নিমাই চাটুজ্জের দলে নাম লিখাইয়া এক পয়সার মিঠা পান কিনিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে মেসে ফিরিল। এ পারের তাসের আসরে হরতনের গোলাম তুরুপ হইল।

জানুয়ারি, ১৯৪১

উপকার

১

পরোপচিকীর্ষার জন্য এ পাড়ায় জগদীশ বাবুর খ্যাতিই সর্বাপেক্ষা বেশি। সেদিন দুপুরের পর দিবানিদ্রার আলস্য ত্যাগ করিতে চেষ্টা করিতেছেন, এমন সময়ে গৃহিণী আসিয়া বলিলেন, খবর শুনেছ ?

কিসের খবর ?

পাড়ায় থাক, আর পাড়ার খবর রাখ না ?

ব্যাপারটা কি বলত ?

তোমাদের ওই রামহরি বোস—ওই বুড়ো যাচ্ছে বিয়ে করতে !

বটে ! এমন খবরটা আমার কাণে পৌঁছয় নি—ছোঁড়াগুলো একেবারে অপদার্থ ! দেখি, এর একটা বিহিত করতেই হবে। কোথায় কার সঙ্গে বিয়ে, কিছু শুনেছ ?

অত আমি জানিনে। শুন্‌লাম নাকি একটা উনিশ বছরের মেয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ হয়েছে—আজই রাত্রে বিয়ে।

কি সর্বনাশ ! উনিশ আর পঞ্চাশ ! আমি বেঁচে থাক্‌তে এ হতে দেবো না। দেখি আমার পাঞ্জাবীটা আর মনিব্যাগটা—এর একটা হেস্তনেস্ত না করে বাড়ী ফিরছি নে। আমার সামনে এসব তরুণীসংহার চল্‌বে না !

২

রামহরিবাবু বাড়ী আছেন ?

কে ?

আজ্ঞে, আমি জগদীশ!

ও, এস এস। তা এমন সময়ে কি মনে করে? আমি তো আজ একটু ব্যস্ত। বরঞ্চ আর এক সময়ে এসো, বসে বসে গল্প সল্প করা যাবে।

আজ্ঞে, আমিও ভয়ানক ব্যস্ত। এখুনি আপনার সঙ্গে দুটো দরকারী কথা না বল্‌লে চল্‌ছে না।

নেহাতই যদি কিছু বলতে চাও তো চট করে বলে ফেল—বললামই তো, আমি একটু ভয়ানক ব্যস্ত আছি আজ।

কথাটা অত্যন্ত গুরুতর। একটু বস্‌তে হবে আপনাকে—আর আমার কথাটা শুনতে হবে।

বেশ তো, যা বল্‌বে, চট করে বলে ফেলো—আমি আজ একটু বিশেষ ব্যস্ত।

তবে শুনুন। শুন্‌লাম আপনি নাকি আজ বিয়ে করতে যাচ্ছেন!

হ্যাঁ—তা তোমাকে কে বল্‌লে?

আর পাত্রীটির বয়স নাকি উনিশ?

দেখে তো তাই মনে হ'ল। তা উনিশ কুড়ি হবে খুব সম্ভব—মেয়েছেলের বয়স, জোর করে কিছু বলা যায় না।

এ বিয়ে তো হ'তে পারে না!

মানে?

মানে, উনিশ আর পঞ্চাশ—অসম্ভব!

কেন?

কেন, তাও আমাকে বুঝিয়ে দিতে হবে?

বুঝতে যখন পারছিনে, তখন বুঝিয়ে দিতে হবে বৈকি।

এই বিয়ে যে মেয়েটির পক্ষে হত্যার সমান, তা বুঝতে পারছেন না?

না।

কি আশ্চর্য! এ বয়সে আপনার বিয়ে করাই উচিত নয়। যদি নেহাতই করতে হয়, তবে চল্লিশ বা অন্ততঃ পক্ষে পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সের মেয়েকেই বিয়ে করা উচিত।

বিয়ে করা উচিত নয়, একথা মানলেও মান্‌তে পারি। কিন্তু যদি বিয়েই করতে হয়, তবে প্রৌঢ়া বিয়ে করব কেন? নিরামিষ আহার ভাল হতে পারে, কিন্তু যদি মাছ খেতেই হয়—

দেখুন, আপনার যে শুধু মানসিক রুচিবিকার ঘটেছে, তা নয়, আপনার ভাষাটাও অত্যন্ত অসংযত।

এ তো আমার ভাষা নয়, তোমাদেরই মহামহোপাধ্যায়দের লেখা পঞ্জিকার ভাষা।

দেখুন, বিয়েটা শুধু ভোগ নয়, ওটা একটা কর্তব্য, একটা দায়িত্ব, একটা সামাজিক ব্যাপার, একটা পারিবারিক অনুষ্ঠান। শুধু ব্যক্তিগত খেয়ালটাকেই বড় করে না দেখে যদি বিরাট মানবতার দিক্ থেকে জিনিষটা বিচার করে দেখেন, তাহলে—

বুঝেছি। আচ্ছা বল তো, আমি যদি মানসীকে বিয়ে নাই করি, তাহলে ওর কোথায় বিয়ে হবে, সে সম্বন্ধে তোমার কোন ধারণা আছে?

তা অবশ্য নেই। ওদের অবস্থার কথা যা শুনলাম, তাতে হয়তো ওদেরই মত গরীব ঘরেই বিয়ে হবে। আপনার মত অবস্থাপন্ন ঘরে হয় তো স্থান পাবে না। কিন্তু তাই বলে ওদের ওই অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে আপনি মানসীর মত একটা রূপসী গুণবতী মেয়ের সর্বনাশ করবেন?

সর্বনাশ করবো! সে কি! আমি যতদূর জানি, মানসীর এতে

অমত নেই। ঘটকের মুখে শুনলাম, আমি যদি এ বিয়ে না করি, তা হলে মানসীর বিয়ে হবে এমন জায়গায়, যেখানে ভাল খেতে পরতেও পাবে না, এমন কি ভগবানের দেওয়া আলো বাতাসটুকুও জুটবে না। পূর্বপুরুষের জরাজীর্ণ বাড়ির নীচের তলার অন্ধকার একখানি ঘর, একটি জান্‌লা আর একটি দরজা—এই তার সম্বল। কোন্ আফিসে পঁচিশ টাকা মাইনের একটা চাকরি, তাতে তার আপিসের ভদ্রবেশ রক্ষা করাও কঠিন। ছোকরার বয়স অবশ্য অল্প—বছর তেইশ চব্বিশ হবে।

সেও ভাল। তবু আপনার মত একটা বৃদ্ধের সঙ্গে বিয়ে—এ হতেই পারে না।

কেন? যদি আমার পক্ষে স্ত্রীর বয়স কামনা করাটা তোমার কাছে নিতান্তই গর্হিত, বিশাল মানবিকতার একান্ত গ্লানিকর বলে মনে হয়, তাহলে স্বামীর রূপ, গুণ, বিদ্যা, মান, যশ, আর্থিক স্বচ্ছলতা, আদর আহ্লাদ, গৃহিণীর পদ-মর্যাদা, সংসারের কর্তৃত্ব, এ সমস্তই উপেক্ষা করে শুধু বয়সটাকেই একমাত্র কাম্য মনে করাটা নারীর পক্ষে গর্হিত নয় কেন? কোন বৃদ্ধ বা বয়স্ক লোক যখন কোন তরুণীকে বিয়ে করতে যায়, তোমরা তৎক্ষণাৎ ধরে নাও যে একটা সবল সুন্দর বিদ্বান্ চরিত্রবান্ বিত্তশালী যুবক তরুণীটিকে তার স্পোর্টস্ কারে তুলে নিয়ে গঙ্গার ধারে হাওয়া খাইয়ে নিয়ে বেড়াতে চায়, আর এই সুখ থেকে তাকে বঞ্চিত করে, এক বৃদ্ধ তাকে জোর করে দুঃখের কূপে নিক্ষেপ করতে চায়। কিন্তু ব্যাপারটা অনেক ক্ষেত্রেই অন্যরূপ—যেমন এ ক্ষেত্রে।

আপনি যদি মানসীর মনটা দেখতে পেতেন, তাহলে বুঝতেন সে কি চায়। তা'ছাড়া অতটুকু খুকির পক্ষে চাওয়া না চাওয়ার মূল্যই বা কি? কিই বা বোঝে সে?

দেখ, আমার প্রথম বিয়েও হয়েছিল আঠার বছরের মেয়ের সঙ্গে।

বাংলা দেশের, বিশেষত গরিবের ঘরের এবং অভিজাত ঘরের, আঠার-উনিশ বছরের খুকিরা কি চায় না চায়, ভাবে না ভাবে, বোঝে না বোঝে, তার খবর তোমার চেয়ে আমি বেশি জানি। তা'ছাড়া মানসীর চেয়ে আমি বয়সে অনেক বড় বলেই তার প্রকৃত মঙ্গল কিসে তা আমার পক্ষে বোঝার সম্ভাবনা বেশি। অভিজ্ঞতারও একটা মূল্য আছে।

আর একটা দিক আপনি একেবারেই ভাবছেন না। এ বিয়ের মানে, ইচ্ছা করে একটি মেয়েকে বালবিধবায় পরিণত করছেন।

দেখ, আমি যে আর বিশ বৎসর বাঁচব না, এ কথা জোর করে বল্‌তে পার? আর যদি শিগ্‌গিরই মরে যাই, এর আর একটা বিয়ের ব্যবস্থা করে দিও—তুমি তো বিধবা-তারিণী সমিতিরও একজন পাণ্ডা।

আপনি তো সাংঘাতিক লোক দেখছি। নিজেই বল্‌ছেন নিজের বিধবা স্ত্রীর বিয়ে দিতে?

কেন বল্‌ব না? তুমি তো জান, আমি বিধবাবিবাহের সমর্থক, তোমাদের সমিতিতে চাঁদাও দিয়েছি। আমি অন্য বিধবাদের সম্বন্ধে যা ভাল মনে করি, আমার স্ত্রী সম্বন্ধেও তাই মনে করি।

কি ভয়ানক লোক আপনি! আপনার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। দেখুন, তরুণীতারণ সমিতির পক্ষ থেকে আমারও একটা কর্তব্য আছে। আপনার এ বিয়ে আমি হতে দেব না।

এই কথাগুলি বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই জগদীশ ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

৩

রামহরিবাবু এ বিবাহে বেশি লোক নিমন্ত্রণ করেন নাই। ক্লাবের কয়েকজন বন্ধুকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহারাই সঙ্গে যাইবেন।

সন্ধ্যার পরেই তাঁহাদের আসিবার কথা। জগদীশের সহিত সাক্ষাৎ হইবার পর তিনি আরও একটু সতর্ক হইলেন। নিজে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্তভাবেই সজ্জিত হইয়া বন্ধুগণের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন এবং স্থির করিলেন যে প্রথমে যিনি আসিবেন, অন্যের জন্য অপেক্ষা না করিয়া, তাঁহার সহিতই একখানি ট্যাক্সিতে বাহির হইয়া পড়িবেন।

সন্ধ্যা হয় হয়। রামহরিবাবু এক কাপ চা খাইয়া একটি সিগারেট ধরাইয়াছেন এবং বন্ধুর জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। এমন সময়ে বাড়ির বাহিরে একটা হৈ চৈ আরম্ভ হইল। জানালা দিয়া রামহরিবাবু দেখিতে পাইলেন, প্রকাণ্ড একদল ছোকরা জড় হইয়াছে। একখানি কচি-কলাপাতা-রঙের সাড়ী দুই পাশে দুইখানা বাঁশের সঙ্গে বাঁধা, তাহাতে বড় বড় অক্ষরে লেখা—তরুণীতারণ সমিতি। দেখিতে দেখিতে ছোকরার দল তিন ভাগে বিভক্ত হইল। এক ভাগ রামহরিবাবুর বাড়ির সিঁড়ির সামনে সটান শুইয়া পড়িল, আর দুই ভাগ দুই পাশে দাঁড়াইয়া পর্যায়ক্রমে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল, তরুণী —জিন্দাবাদ, তরুণী—জিন্দাবাদ। চারিদিক হইতে কাতারে কাতারে লোক ছুটিল তামাসা দেখিতে।

রামহরিবাবুকে এ পাড়ায় সকলেই জানে। তাঁহার বাড়ির সাম্‌নে এমন একটা বিকট দৃশ্য তাঁহার মোটেই প্রীতিকর মনে হইল না। তিনি দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিলেন এবং দলপতি জগদীশকে ডাকিয়া সবিনয়ে বলিলেন, আমি কথা দিচ্ছি, এ বিয়ে আমি করব না—তুমি দয়া করে তোমার সবুজবাহিনীটাকে এখান থেকে সরাও।

বিজয়-সেনানী এইরূপে হেলায় যুদ্ধ জয় করিয়া পুরস্কার স্বরূপ নিকটবর্তী একটি রেঁস্তোরায় ঢুকিয়া এক কাপ চা আর একখানি করিয়া ফাউল কাটলেট খাইয়া স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্তন করিল।

৪

যে বয়সে মনে হয় জগতে মাত্র একটি মেয়েকেই বিবাহ করা সম্ভব এবং তাহার সহিত বিবাহ না হইলে আত্মহত্যাই বিধেয়, সে বয়স রামহরিবাবুর নাই। সুতরাং মানসীর পরিবর্তে ললিতাকে পছন্দ করিতে তাঁহার বেশি বিলম্ব হইল না।

ঘটকের সহিত পরামর্শ করিয়া পাত্র এবং পাত্রী উভয়ই এমন স্থান এবং এমন কাল মনোনীত করিলেন যেটা তরুণী-তারণ সমিতির জুরিস্‌ডিক্‌সনের বাহিরে। পিতৃমাতৃহীনা চঞ্চলা রূপসী ললিতা সজ্জিতা ও সালঙ্কারা হইয়া রামহরির গলায় মালা পরাইয়া দিল।

জগদীশের চেষ্টায় মানসীরও বিবাহ হইয়া গেল। আফিসের সেই ছোকরা সুধীর নিজের শতবঞ্চিত, শতধিকৃকৃত জীবনের মধ্যে ভগবানের আশীর্বাদরূপে কম্পিতহৃদয়ে মানসীকে আপন জীবনসঙ্গিনীরূপে বরণ করিয়া লইল।

মানসী-রামহরি ভাঙ্গিয়া দুই টুকরা হইয়া ললিতা-রামহরি ও মানসী-সুধীরে পরিণত হইল।

৫

তিন বৎসর পরের কথা।

শীর্ণ ক্লান্ত দেহখানি কোনমতে বহন করিয়া ছিন্ন মলিন একটি জামা গায়ে সুধীর আপিস হইতে বাড়ী ফিরিয়াছে। ততোধিক মলিন একখানি সাড়ী গায়ে জড়াইয়া রুগ্ন শয্যাগত মানসী নবাগত ক্ষুদ্র মানবিকাটিকে সাদরে জড়াইয়া ধরিয়া প্রায় অচেতন অবস্থায় পড়িয়া আছে।

সুধীর বলিল, কেমন আছ?

ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর আসিল, আমার আর থাকাথাকি নেই। থাকবার ইচ্ছেও নেই। কিন্তু এই সুখশেলটার জন্যই মরেও আমার শান্তি নেই। ভগবান্ কেন একে পাঠালেন এই নিরন্ন কুটীরে?

অত উতলা হয়ো না। একটু ভাল চিকিৎসা হলে শীগগিরই সেরে উঠবে। কিন্তু কি করি? বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় স্বজন কারো কাছে হাত পাত্‌তে বাকি রাখি নি। তোমার গায়ের গয়নাগুলোও এক একখানা করে শেষ করেছি। ডাক্তার বলে এখানে অসুখ সারবে না— চেঞ্জে যাও। আমার যে এই ঘরখানা ছেড়ে অন্য ঘরে যাবার সঙ্গতিও নেই। চেঞ্জ তো দূরের কথা।

সবই তো বুঝ্‌ছি। বাঁচবার সাধ আমার একটুও নেই। কিন্তু, এই এটাই তো আমাকে মর্‌তে দিচ্ছে না। এই নাও, এই বালাটা নিয়ে যাও, দেখ কিছু ওযুধ পথ্যের জোগাড় করতে পার কি না। সামনের মাসে নাকি তোমাদের আপিস থেকে কিছু বোনাস পাবে, তাই থেকে এ দেনা শোধ করা যাবে। যাও, আপত্তি করো না। ঐ কোণে দেখ দুখানা রুটি আর একটু গুড় আছে, মুখে দিয়ে একটু জল খেয়ে যাও—আমি আর এখন উঠতে পারছি নে।

ঠিক এই সময়েই চৌরঙ্গী রোড দিয়া একখানা ভি-এইট ফোর্ড দুইটি যাত্রী লইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। বলা বাহুল্য, যাত্রী দুইটি আমাদের ললিতা আর রামহরি। ললিতা বলিল, তোমার পছন্দের বাহাদুরি আছে। এই জন্যই তো বলি, আমাকে না নিয়ে কখনো দোকানে যেও না।

তোমাকে যারা দেখেছে, তারা কিন্তু বলে আমার খুব পছন্দ!

আচ্ছা! দেখতো ফ্রকটার কি ছিরি, যেমন কাজ তেমনি তার ডিজাইন—

আমার তো ভালই লেগেছিল। তা বাইশের পছন্দ আর তিপ্পান্নর পছন্দ মিল্‌বে কেন ?

আবার ঐ বয়সের কথা! তোমার তিপ্পান্নর তো কোন লক্ষণ দেখছিনে। এই বার আনার ফ্রক বদলাতে দেড় টাকার পেট্রল খরচ— এটা তিপ্পান্নর লক্ষণ নয়, তেইশের।

তুমি যে বললে, তোমার পছন্দ হয়নি।

বল্‌লামই বা। সবই আমার পছন্দ মত করতে হবে ? তোমার অতটা ইয়ে আমার ভাল লাগে না।

তাই নাকি। আমার তো সব সময়েই ভয় হয়, কিসে তুমি মনে কষ্ট পাও।

আমি কি কচি খুকি নাকি ? তোমার মনের ভাব সব আমি বুঝি। তুমি সত্যিই অমন করো না। তোমার আমার স্থবিধে অস্থবিধে, ভাল মন্দ সব তো এখন একাকার হয়ে গেছে। বয়সের ফাঁকটা ভুলে যাও।

তুমি ভুলতে পারবে ?

কেন, আমাকে কখনো অখুসি দেখেছ ?

তা দেখিনি, আশ্চর্য মেয়ে তুমি !

আশ্চর্য মোটেই না, অতি সাধারণ।

মোটর নিউ মার্কেটের সামনে আসিয়া দাঁড়াইতে উহাদের কথোপকথন বন্ধ হইল।

৬

জগদীশ চা খাইতেছে। গৃহিণী বলিলেন, মানসীর কোন খবর রাখ ?

রাখি বই কি, বড় কষ্টে আছে তারা। ও হয়তো আর বেশিদিন বাঁচবে না।

এর জন্য কি তুমি দায়ী নও?

তা খানিকটা দায়িত্ব আছে বই কি?

খানিকটা? সম্পূর্ণ দায়িত্ব তোমার। তুমিই মেয়েটার সর্বনাশ করেছ। ললিতাকে দেখে আনন্দ হয়। কেমন সুখে আছে—কোন দুঃখই তো দেখি না।

মনে মনে সুখী হয়েছে কি না কে জানে?

এতদিন ধরে মিশছি আর তার মনের কথা বুঝতে পারি না!

যাক্, মানসীর বদলে ললিতা তো সুখী হয়েছে।

ও ব'লে আর মনকে সান্ত্বনা দিয়ে কি হবে! সে যাক্, যা হবার হয়ে গেছে। এখন থেকে তোমার তরুণীতারণ ছাড়তে হবে।

কেন?

কে কেমন করে কার দ্বারা তারিত হয় বা প্রতারিত হয়, তা বোঝা সহজ নয়—ও সবের মধ্যে না থাকাই ভাল।

সত্যি, ও সবের মধ্যে না থাকাই ভাল।

সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮
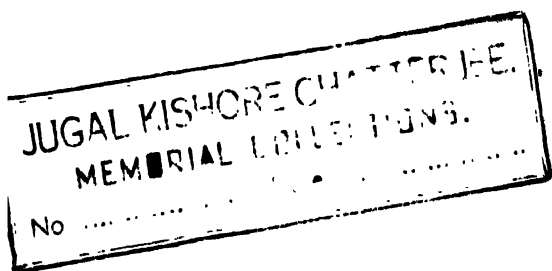
আর্ট ও জুতা

কথাটা বলিবার মত কিছু নয়, তবু—

প্রায় মাস দুই পূর্বে একদিন দেখি, বাঁ পায়ের জুতাটার সামনের দিকের সেলাই একটু খুলিয়া গিয়াছে। তৎক্ষণাৎ ইংরেজী প্রবাদটি মনে পড়িয়া গেল, সময়মত একটি ফোঁড় দিতে পারিলে ভবিষ্যতে নয়টি ফোঁড় দিবার আবশ্যক হইবে না। কিন্তু অভাব তো নীতিকথার নয়, নীতিকার্যের। গ্রহেরও এমনই ফের যে, যখন সেলাইক্রুশ হাঁকাহাঁকি করে, তখন জুতামহাশয়ের অবসর থাকে না, আবার যখন জুতা বেকার বসিয়া থাকে, তখন সেলাইক্রুশ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। একদিন হ্যারিসন রোডের মোড়ে বাস হইতে নামিতে যাইতেছি। বাস অবশ্য এখানে থামে। কিন্তু চলন্ত বাস হইতে ওঠানামা একটা মুদ্রাদোষের মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। চলন্ত বাস হইতে নামিবার জন্য পা দুইখানি সুড়সুড় করিতে লাগিল, এবং বেশ একটু আর্টের সঙ্গেই নামিয়া পড়িলাম। ফলে পায় অত্যধিক চাপ লাগায় পট করিয়া একটা শব্দ হইল এবং পায়ের দিকে চাহিতেই দেখিলাম, বাঁ পায়ের জুতাটি কুমীরের বাচ্চার মত হাঁ করিয়া আছে।

ভাগ্যিস কলেজ ষ্ট্রীট। কোন দিকে না চাহিয়া নিকটেই একটি জুতার দোকানে ঢুকিয়া পড়িলাম। দোকানদার পায়ের দিকে চাহিয়া দেখিল, কিন্তু খরিদ্দার-লক্ষ্মীকে তাহা জানিতে দিল না। একজোড়া অ্যাল্‌বার্ট স্লিপার চাহিলাম। কালো, ব্রাউন, চকলেট প্রভৃতি বহু রঙের বহু জুতা বাহির হইল। কিন্তু কোনটিই পায়ে তেমন ভাল করিয়া লাগে না। বলিলাম, এত জুতো রেখেছেন, সবই তো প্রায় এক

ধাঁজের। সকলের পা তো ঠিক এক ধাঁজের নয়, জুতোর গড়নটার একটু তারতম্য ক'রে নানা রকম জুতো রাখলে সুবিধে হয় না কি?

আজ্ঞে, এ জোড়া?

ও তো একটু ঢিলে হচ্ছে।

একটা সুখতলা লাগিয়ে দিলেই ঠিক হবে।

তা কি হয়?

আচ্ছা, এই জোড়া?

ও তো পাশে ছোট হচ্ছে।

তাতে কি, এখনি বাড়িয়ে দিচ্ছি। ওরে, নিয়ে আয় তো—

ওতে ঠিক হয় না। এখন হয়তো একটু ঢিলে মনে হবে, দুঘণ্টা পরে আবার যে-কে-সেই।

কি করব বলুন? এ জুতোর এই শেপই আজকাল চলছে।

আজকাল কেন? আমি তো জন্মাবধি এই শেপই দেখছি। কোন্ মান্ধাতার আমলে কে একটা কাঠের ছাঁচ তৈরি করেছিল, তাই চলছে।

আজ্ঞে না, সার্। আমাদের নিজের ফ্যাক্টরিতে নিজের মিস্ত্রী দিয়ে সব জুতো তৈরি, আমরা খদ্দেরের চাহিদামত জুতো তৈরি করি।

হ্যাঁ, ফ্যাক্টরি তো কত! মুচিগুলো নিজেদের খুশি আর বুদ্ধি অনুসারে জুতো সেলাই ক'রে রাত্রি নটার পর দোকানে দোকানে ফিরি ক'রে বেড়ায়, আর তার সুখতলার ওপর এক এক দোকানের ছাপ মেরে এক একটা ফ্যাক্টরি তৈরি হয়।

দোকানদারের সহিত কিছুক্ষণ এইরূপ বাদানুবাদের পর নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারিলাম, আমারই ভুল হইয়াছে। জুতাগুলি সবই ঠিক আছে, আমার পা-ই তাহাতে ফিট করিতেছে না। সুতরাং আর তর্কবিতর্ক না করিয়া একজোড়া ব্রাউন অ্যালবার্ট স্লিপার কিনিয়া ফেলিলাম।

দাম চুকিয়া গেলে দোকানদার বলিল, এই জুতোটাই কি পায়ে দেবেন? নিতান্ত নির্লিপ্তভাবেই বলিলাম, তা দিন। নতুন জুতো, যত শিগগির পায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয় ততই ভাল।

দোকানদার জুতার বাক্সে আমার পুরাতন জুতাজোড়া বাঁধিয়া দিল। দোকান হইতে বাহির হইয়া নিকটবর্তী একটা ডাস্টবিনে প্যাকেটটা ফেলিয়া দিলাম।

নূতন জুতা পরিয়াছি। আঙুলে একটু লাগিতেছে, তা লাগুক। কনিষ্ঠা অনামিকার কাঁধে উঠিয়া বসিয়াছে, তা বসুক। একটু টনটন করিতেছে, তা করুক। একটু না হয় ফুলিয়া উঠিবে, তা একটু টিংচার আইডিন দিলেই হইবে। ফোস্কাও পড়িতে পারে, তাতে আর ভয়ের কি আছে? কিংবা একটু ঘাও হইতে পারে, হয়তো শেষটা সেলুলাইটিস কিংবা গ্যাংগ্রিন হইলেও হইতে পারে। বড় জোর দুইটা আঙুল অ্যাম্পুটেট করিয়া ফেলিতে হইতে পারে। তাতে আর কি? দুই পায়ে দশ দশটা আঙুল, গোটা চারেক না হয় বাদই গেল। তাই বলিয়া পাদুকীয় আর্ট তো ক্ষুণ্ণ করা যায় না। জুতার গড়নের দিকে চাহিলে চোখ জুড়াইয়া যায় না! আঙুলের মমতা কোথায় বিলীন হইয়া যায়! আমের পল্লবের মত কমনীয়, মোচার খোলার মত সুখস্পর্শ, পাবদামাছের মত কোমল, মসৃণ এবং লঘু এই অ্যাল্‌বার্ট স্লিপারে আর্টের যে বিকাশ হইয়াছে, তুচ্ছ পায়ের আঙুলের জন্য তাহার অবমাননা করিলে তাহাতে মনুষ্যত্বেরই অবমাননা হইবে যে! আঙুলের চেয়ে মনুষ্যত্ব অনেক বড়।

কলেজ স্ট্রীট অঞ্চলের দুই একটা কাজ শেষ করিয়া ভাবিলাম, একবার শ্বশুরবাড়িটা ঘুরিয়া যাই। গোয়াবাগান এমন আর কি বেশি দূর! সাধারণ কুশলপ্রশ্নের পর যথারীতি একটু চা খাইতে হইল।

একখানি কার্পেটের আসনে বসিয়া জামাতৃজনোচিত বিনয় ও সতর্কতার সহিত আহারে প্রবৃত্ত হইলাম। দেখিলাম, ছোট শ্যালিকাটি মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। অবশ্য শ্যালিকাজাতীয়া নারীদিগের প্রধান কর্তব্যই হাসি, তবু এ হাসিটা ঠিক অন্য দিনের মত 'বোনাফাইডি' মনে হইল না। আমিও অবশ্য হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া লঘু হইতে চাহিলাম না, কিন্তু মনে একটু খটকা, একটু ঔৎসুক্য রহিয়াই গেল।

আসন ছাড়িয়া উঠিয়া বারান্দায় গিয়া যখন আঁচাইব, তখন কোঁচাটি সন্তর্পণে গুছাইয়া দুই হাঁটুর মধ্যে চাপিয়া ধরিতেই পায়ের দিকে দৃষ্টি পড়িল। দেখি, দুই পায়ে গাঢ় গেরুয়া রঙের আলতা। শ্যালিকা মহাশয়া নিকটেই ছিলেন। তাঁহার হাসির কারণ বুঝিতে পারিয়াছি দেখিয়া তিনি আরও উচ্চৈস্বরে হাসিয়া উঠিলেন। গত্যন্তর না থাকায় আমিও তাঁহার হাসিতে যোগ দিলাম।

ক্যাশ-মেমো পকেটেই ছিল। গোয়াবাগান হইতে সোজা কলেজ স্ট্রীট। দোকানদারকে বলিলাম, মশায়, জুতোজোড়া ফিরিয়ে নিন। দেখুন তো পায়ের কি অবস্থা! এ রঙ কেন লাগালেন?

নইলে ভেতরটা দেখতে বিশ্রী হয়।

কিন্তু এতে যে সমস্ত পা'টা বিশ্রী হয়।

আজ্ঞে, জুতোর জন্যেই তো পা, পায়ের জন্যে তো জুতো নয়।

বাজে কথা রাখুন। এ জুতো আপনাকে ফেরত নিতেই হবে।

আজ্ঞে, ব্যবহার করা জুতো ফেরত নিতে পারব না।

নিতেই হবে।

আজ্ঞে, মাপ করবেন।

বেশ, কালই উকিলের চিঠি পাবেন। কৌশলে আমার পায়ে

আলতা পরিয়ে লোকের সামনে (শ্যালিকার কথাটা চাপিয়া গেলাম) অপমান করার জন্য খেসারৎ দিতে হবে। আচ্ছা, নমস্কার।

শুনুন সার্, দিন তবে জুতোজোড়া। খদ্দের-লক্ষ্মীকে কি অসন্তুষ্ট করতে পারি? এক দিনের তো কাজ নয়। আপনাদের কাছে আরও পাঁচ দিনের আশা রাখি। আমি দাম ফিরিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু দেখবেন, সব দোকানেই এই রকম।

তাও তো বটে। সবই তো একই ফ্যাক্টরির জুতো। দিন তবে, কি আর করা যাবে।

এই দোকানদারটির প্রতি আমার যে সংকীর্ণ পঙ্কিল ক্রোধের সঞ্চার হইয়াছিল, ক্রমশঃ তাহা বিস্তৃতি ও বিশুদ্ধি লাভ করিয়া সমগ্র জুতাব্যবসায়ীর প্রতি একটা উদার অনাবিল ক্রোধে পরিণত হইল। মনে শান্তি পাইলাম।

দুঃখের বিষয়, উপরোক্ত গেরুয়া রঙটি যেরূপ তৎপরতার সহিত জুতা ছাড়িয়া পায়ে আসিয়া লাগিয়াছিল, পা ছাড়িয়া যাইতে সেরূপ তৎপরতা দেখা গেল না। প্রত্যহ গরম জল ও সাবান ব্যবহার এবং বাড়ির বাহিরে যথাসম্ভব জুতা-ত্যাগ পরিহার করিতে লাগিলাম। প্রায় এক মাস পরে এই বৈষ্ণবধর্মী রঙ আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে। জুতার আর্ট ক্ষুণ্ণ হয় নাই, এই চিন্তাই আমাকে এতদিন সান্ত্বনা দিয়াছে।

অক্টোবর, ১৯৩৮

প্রাতর্ভ্রমণ

১

প্রেম দুই প্রকার—আবশ্যিক এবং ঐচ্ছিক। এই দুই প্রকার প্রেমের বিরোধ এক দিকে যেমন সমাজের মৌলিক সমস্যাগুলির মূল, তেমনই যুগযুগান্ত ধরিয়া এই বিরোধই সর্বপ্রকার সাহিত্য, আর্ট, এমন কি ধর্মবুদ্ধির মূলেও প্রেরণা যোগাইয়া আসিতেছে।

মানুষ সাধারণত কর্মক্ষেত্রে আবশ্যিক এবং ধর্মক্ষেত্রে ঐচ্ছিক প্রেমের পক্ষপাতী। বর্তমান যুগে সামাজিক ক্ষেত্রেও ঐচ্ছিকতার প্রসার বৃদ্ধি পাইতেছে। বিবাহের পূর্ববর্তী প্রেম ঐচ্ছিক এবং পরবর্তী প্রেম আবশ্যিক। ইহাই ঐচ্ছিকপন্থী এবং আবশ্যিকপন্থীদের মধ্যে বিরোধের মূল কারণ, অথচ বিবাহের পর ঐচ্ছিক এবং আবশ্যিক প্রেমের প্রভেদ যে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া যায়, এই সামান্য সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করিলেই এই বিরোধের কারণ অন্তর্হিত হইতে পারে।

যাহা হউক, লেক রোডের মিঃ বাসু ঐচ্ছিকপন্থী। সম্প্রতি বিলাত হইতে ব্যারিষ্টারি পাস করিয়া ঐচ্ছিক মতে বিবাহ করিয়াছেন এবং লেক রোডে বাসা করিয়াছেন। পিতা ধর্মচর্চা এবং শেয়ার-চর্চা করিয়া দিনাতিপাত করেন। মাতাঠাকুরাণী দান করেন, পূজা করেন, গৃহস্থালী দেখেন এবং কনে-বউয়ের মত সাজিয়া-গুজিয়া সিনেমায় যান।

নিকটেই লেক। লোকমুখে শুনা যায়, একবার লেক ঘুরিয়া আসিলেই মনে স্ফূর্তি হয়, শরীরে বল হয়, রক্ত-চলাচল ভাল হয়, লিভার ফাংশন উন্নত হয়, ঘর্মনিঃসরণহেতু রোমকূপগুলি পরিষ্কৃত হয়, পেশীগুলি

সবল হয়, ইউরিক অ্যাসিড বিনষ্ট হয়, মেদ ও চর্বি কমিয়া যায়, দৈর্ঘ্য বাড়িয়া যায়, অগ্নিমান্দ্য তিরোহিত হয়, রক্তের চাপ স্বাভাবিক হয়, পাকা চুল কাঁচা হয়, টাকে কেশোদ্গম হয়, লোলচর্ম কোমল হয়, দৃষ্টিশক্তি প্রখর হয়, কর্মশক্তি দ্বিগুণিত হয় এবং দেহের কান্তি ও লাবণ্য শতগুণ বর্ধিত হয়।

সুতরাং মিঃ বাসু সস্ত্রীক লেকভ্রমণ আরম্ভ করিয়াছেন।

একদিনের কথা। বাসুদম্পতী প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। বাসু সাহেবের পরনে হাফ-শার্ট, হাফ-প্যাণ্ট, হাত-ঘড়ি, মোটা মোজা, ক্যান্‌ভাসের জুতা, আর হাতে একগাছি চেরিকাঠের ছড়ি। মিসেসের পরনে আঁটসাঁট করিয়া জড়ানো হালকা বেগুনী রঙের মাদুরা শাড়ি, ভয়লের ছিটের ব্লাউজ, পায়ে গোড়ালি-খোলা স্ট্র্যাপ-দেওয়া কালো বার্নিশ-করা শ্লিপার, কানে ছোট্ট দুইটি দুল, গলায় সরু লকেট-হার, হাতে একখানি রঙিন রুমাল, কপালে একটি ছোট্ট সিন্দূরের টিপ।

বাড়ি হইতে বাহির হইয়া লেক রোড দিয়া আসিয়া ল্যান্সডাউন রোড এক্‌স্টেনশন দিয়া সাদার্ন অ্যাভেনিউ পার হইয়া আসিতেই মিসেস বলিলেন, দেখ, আমার শরীরটা আজ তেমন ভাল নেই, তোমার সঙ্গে অত তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারছি নে।

মিঃ বাসু বলিলেন, তবে চল, একটু আস্তে আস্তেই যাওয়া যাক।

আস্তে হাঁটলে তো তোমার হাঁটাই হয় না।

তা হ'লে চল, আজ বরং বাড়ি ফিরে যাই।

না। তার চেয়ে এক কাজ করা যাক। তুমি ডান দিক দিয়ে জোরে হেঁটে যাও, আর আমি বাঁ দিক দিয়ে আস্তে আস্তে হাঁটি। আবার এখানে এসে দুজনে একসঙ্গে ফিরলেই হবে। তুমি এসে আমার জন্যে একটু অপেক্ষা ক'র।

বেশ, সেই ভাল।

এই কথার পর মিসেস ক্লক-ওয়াইজ এবং মিস্টার কাউণ্টার-ক্লক-ওয়াইজ লেক ঘুরিতে আরম্ভ করিলেন।

২

লেক ক্লাবের বাঁ দিক দিয়া মিসেস আস্তে আস্তে অগ্রসর হইতেছেন, ঝির্‌ঝির্ করিয়া বাতাস বহিতেছে, উদীয়মান সূর্য্যের ঈষৎ-রক্তাভ কিরণ মুখের উপর আসিয়া পড়িতেছে আর সেই কিরণে কানের দুল দুইটি ও হাতের হীরার আংটিটি চিকচিক করিতেছে। ক্লাবের সীমানা পার হইতেই সম্মুখে একটি আধ-যুবা আধ-প্রৌঢ় ভদ্রলোককে দেখিয়া মিসেস হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে দেখিলেই মনে হয়, তিনি ঐচ্ছিকপন্থী। ভদ্রলোক হাফপ্যাণ্ট-হাফশার্ট-শোলাহ্যাট-সমন্বিত এবং মন্থরগতি, দ্রুতভাষী, মৃদুহাসি ও মুগ্ধদৃষ্টি। ইনিই প্রথম কথা বলিলেন, এই যে, আপনি?

হ্যাঁ।

নমস্কার।

নমস্কার।

আপনি তো দেখছি বিবাহিতা। কই, একখানা নিমন্ত্রণ-পত্রও তো পেলাম না!

আপনার এখনকার ঠিকানাটা ঠিক জানা ছিল না।

জানা থাকলে নিমন্ত্রণ করতেন?

নিশ্চয়ই। আপনি বুঝি এখনও বিয়ে করেন নি?

এ যাত্রা ওটা বাকিই থেকে গেল।

কেন বলুন তো?

তাও আবার জিজ্ঞেস করছেন, মানে জিজ্ঞেস করতে পারছেন?

যাকগে। আপনি বুঝি রোজই বেড়ান?

প্রায়ই। কিন্তু আপনি একা যে?

ক্ষতি কি?

রোজই কি একা আসেন?

না। আজও একা নই। উনি ঐদিক দিয়ে ঘুরে আসছেন।

আপনার স্বামীর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেবেন না?

নিশ্চয়ই দোব। চলুন, আমরা এদিক দিয়ে এগিয়ে যাই, পথেই ওঁর সঙ্গে দেখা হবে।

আমি দুবার ঘুরেছি, আর পারছি না। চলুন, বরঞ্চ ঐ বেঞ্চিটায় একটু বসি, যতক্ষণ না মিস্টার এসে পৌঁছোন।

তার চেয়ে বরং আস্তে আস্তে একটু এগোই, কি বলেন।

ও, বুঝেছি। আপনার স্বামী বুঝি—

না না, সেকি! তিনি আবার কি মনে করবেন? চলুন, তবে একটু বসাই যাক।

উভয়ে গিয়া তালগাছের তলায় একটি বেঞ্চিতে উপবিষ্ট হইলেন। আধ-যুবা আধ-প্রৌঢ় ভদ্রলোক অনর্গল বকিয়া যাইতে লাগিলেন, এবং মিসেস ক্রমাগত, হাঁ, না, হুঁ, উঁহু, বেশ, ও আচ্ছা, সেকি, নিশ্চয়ই, কক্ষনো না, যান, তাই নাকি, ছিঃ আবার, বটে, ভাই তো, থাকগে, প্রভৃতি স্বল্পাক্ষর শব্দ দ্বারা উত্তর দিয়া যাইতে লাগিলেন।

সময় কাটিতে লাগিল, বেলা বাড়িতে লাগিল, রৌদ্র উঠিতে লাগিল, বাতাস কমিতে লাগিল, মিসেস ঘামিতে লাগিলেন, মাথার কাপড় কাঁধের উপর আসিয়া পড়িতে লাগিল, মিসেস চঞ্চল হইতে আরম্ভ করিলেন, এবং উভয়ে পূর্বদিকে মিঃ বাসুর উদয়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

৩

কাউণ্টার-ক্লক-ওয়াইজগামী মিঃ বাসু ছোট এবং বড় লেকের মাঝের পুল পার হইয়া মাড়োয়ারী ক্লাবের পাশ দিয়া একটু অগ্রসর হইতেই জনৈকা আধ-যুবতী আধ-প্রৌঢ়া মহিলার সম্মুখীন হইলেন। মহিলাটিই প্রথম কথা বলিলেন, এই যে, আপনি!

হ্যাঁ, নমস্কার।

নমস্কার।

আপনি বুঝি এই অঞ্চলেই থাকেন?

হ্যাঁ। আপনি বিলেত থেকে ফিরলেন কবে?

এই তো মাত্র বছরখানেক হবে। আপনি—মানে—কিছু মনে করবেন না—এখনও—

হ্যাঁ, এখনও আমি একাই আছি, আর তাই থাকব।

কেন বলুন তো?

তাও আবার জিজ্ঞেস করছেন, মানে—জিজ্ঞেস করতে পারছেন? যাকগে, আপনি—

আমার কথা আর বলবেন না। জালে জড়িয়ে পড়েছি।

বেশ তো। কন্‌গ্রাচুলেশন্‌স্। আপনার স্ত্রীর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেবেন না?

নিশ্চয়ই। তিনি লেকের ওপাশ দিয়ে এদিকেই আসছেন। চলুন, আমরা এগোই, সামনেই তাঁর সঙ্গে দেখা হবে।

আমি অনেক হেঁটেছি। আর পারছি না। বরঞ্চ এখানে একটা বেঞ্চিতে বসা যাক। উনি তো একটু পরেই এসে পড়বেন।

না, বরং আমরাও এগোই, মানে—

ও, বুঝেছি। আপনার স্ত্রী বুঝি—

না না, সেকি ! তিনি কিছু মনে করবেন না। চলুন, ঐ আমতলার একটা বেঞ্চিতে একটু বসাই যাক।

উভয়ে গিয়া বেঞ্চিতে উপবিষ্ট হইলেন। আধ-যুবতী আধ-প্রৌঢ়া মহিলা অনর্গল বকিয়া যাইতে লাগিলেন, আর মিঃ বাসু হাঁ, না, আচ্ছা, বেশ তো, কিন্তু, নিশ্চয়ই, যান, উঁহু, যাকগে, কক্ষনো না, তাই নাকি, ইস, বটে, প্রভৃতি স্বল্পাক্ষর শব্দ দ্বারা উত্তর দিতে লাগিলেন।

সময় কাটিতে লাগিল, বেলা বাড়িতে লাগিল, রৌদ্র উঠিতে লাগিল, মিঃ বাসু ঘামিতে লাগিলেন, বার বার ছড়ি ঘুরাইতে লাগিলেন, এবং উভয়ে সতৃষ্ণ নয়নে পূর্বদিকে মিসেসের উদয়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ পরে মিঃ বাসু অধৈর্য হইয়া বলিলেন, নাঃ, একবার উঠে দেখা যাক, কেন এত দেরি হচ্ছে।

আধ-যুবতী আধ-প্রৌঢ়া মহিলাটি বলিলেন, কি লাভ? যদি আমাদের বিপরীত দিক দিয়ে আসেন, যেমন আসবার কথা, তা হ'লে তো এখানে ব'সেই দেখা হবে। আর আমরা যেদিক দিয়ে যাব, তিনিও যদি সেই দিকেই ঘোরেন, তবে তো সারাদিনেও দেখা হবে না। সুতরাং এখানে ব'সে অপেক্ষা করাই ভাল।

সুতরাং তাঁহারা বসিয়াই রহিলেন।

যখন মিঃ বাসু আধ-যুবতী আধ-প্রৌঢ়া মহিলাটির সহিত আমতলায় এবং মিসেস আধ-যুবা আধ-প্রৌঢ় ভদ্রলোকটির সহিত তালতলায় বসিয়া ঘামিতেছিলেন, তখন তাঁহাদের লেক রোডের বাড়িতে হুলস্থূল পড়িয়া

গিয়াছে। ছেলে-বউকে এত বেলাতেও ফিরিতে না দেখিয়া পিতা এবং মাতা উভয়েই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন। সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত বিবিধ লৌকিক ঘটনা মনে করিয়া আরও অস্থির হইয়া পড়িলেন। ঝি বলিল, গত রাত্রে বউদিদির মুখখানা ভার-ভার দেখাচ্ছিল। পুরাতন চাকর বলিল, গত রাত্রে শুইতে যাইবার আগে দাদাবাবুর মুখখানা খুব শুকনো দেখাচ্ছিল। কি সর্বনাশ! তা হ'লে কি—

থানায় খবর গেল। ডাক্তারকে খবর দেওয়া হইল। কলিকাতায় যে-সব আত্মীয়-স্বজন ছিলেন, তাঁহাদিগকে সংবাদ দেওয়া হইল। ছেলের শ্বশুর-বাড়ি-সম্পর্কিত যাঁহারা কলিকাতায় ছিলেন, তাঁহাদিগকে খবর পাঠানো হইল।

বেলা দশটার মধ্যে মিঃ বাসুর বাড়ি লোকে ভরিয়া গেল। বিভিন্ন পুরুষ ও নারী বিভিন্ন প্রকার মন্তব্য করিতে লাগিলেন। আধুনিকপন্থী জনৈক কুটুম্ব বলিলেন, যত সব ছেলে-ছোকরার কাণ্ড! বেরিয়েছে কোথায় ট্যাক্সি ক'রে বেড়াতে। খাবার সময় হ'লেই সুড়সুড় ক'রে বাড়ি ঢুকবে। শুধু শুধু এত সব হাঙ্গামা! বাগবাজারের বনেদী-ঘরের জনৈকা মহিলা একসঙ্গে চারটি পান এবং এক আউন্স দোক্তা গালে পুরিয়া দিয়া বলিলেন, যখন বালিগঞ্জে বাড়ি করে, তখনই পই পই ক'রে মানা করেছিলাম, শুনলে তো না!

সাড়ে দশটার সময়ে লেক রোড হইতে অভিযান সুরু হইল। প্রথমে তিনখানা ছয়-সিলিণ্ডার মোটর-গাড়ি; তারপরে একখানা অ্যামবুল্যান্স; তারপরে একখানা ট্যাক্সিতে পুলিসের লোক; তারপরে ডাক্তারের গাড়ি; তারপরে একখানা গাড়িতে একটি লেডি ডাক্তার, দুইটি নার্স ও দুইটি ঝি; তারপর একখানি গাড়িতে একখানি প্রকাণ্ড জাল এবং তিনটি বলিষ্ঠ জেলে; তারপরে সংবাদ-পত্রের রিপোর্টার ও

ফোটোগ্রাফার; সর্বশেষে নারীরক্ষা-মণ্ডলীর জনৈক প্রতিনিধি এবং তাঁহার সহকর্ম্মিণী।

সাদার্ন অ্যাভেনিউ পার হইয়া অভিযানটি দ্বিধাবিভক্ত হইল। এক ভাগ ক্লক-ওয়াইজ এবং অপর ভাগ কাউণ্টার-ক্লক-ওয়াইজ যাত্রা করিল।

একটু পরেই ক্লক-ওয়াইজগামী একখানি মোটর-গাড়ি হইতে বাগবাজারের বনেদী মহিলাটি বলিয়া উঠিলেন, ওই যে আমাদের শৈলী, কিন্তু সঙ্গে ওটি কে?

ওদিকে কাউণ্টার-ক্লক-ওয়াইজগামী একখানি গাড়ি হইতে মিঃ বাসুর মাতাঠাকুরাণী বলিয়া উঠিলেন, ওই যে আমাদের খোকা! কিন্তু সঙ্গে ওটি কে?

৫

লেক রোডের বাড়িখানিতে আজ সারাদিন সমাগত ও সমাগতাদিগের হৈ-হৈ রৈ-রৈ চলিতে লাগিল। বন্ধু, বান্ধবী, আত্মীয়, আত্মীয়া, প্রতিবেশী প্রভৃতির আলোচনা, সমালোচনা, মন্তব্য, কটাক্ষ, ব্যঙ্গ, ভৎর্সনা, উপদেশ প্রভৃতির বন্যায় বাড়িখানি ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইল, এবং তন্মধ্যে খোকা ও শৈলী গৃহ হইতে গৃহান্তরে ছুটিয়া এবং পলাইয়া কোনক্রমে আত্মরক্ষা করিল।

রাত্রে মিঃ বাসু বলিলেন, আচ্ছা, তোমার আক্কেলটা কি, শুনি? বেলা সাড়ে দশটা পর্যন্ত লেকের ধারে বেঞ্চিতে ব'সে না থেকে বাড়ি চ'লে এলেই তো পারতে! তা হ'লে এই হুলস্থূলটা হ'ত না।

মিসেস বলিলেন, তোমারই বা আক্কেলটা কি? অতক্ষণ পর্যন্ত আমতলায় ব'সে না থেকে একটু দেখলেই পারতে, স্ত্রীটির কি হ'ল! তুমিও তো বেশ নিশ্চিন্তই ছিলে!

উভয়ে উভয়ের প্রতি ভীষণ চটিলেন, অথচ কেহই কাহাকেও যুক্তি দ্বারা পরাস্ত করিতে পারিলেন না। সুতরাং চটিয়াই রহিলেন।

কিছুক্ষণ পরে, কণ্টকেনৈব কণ্টকম্‌, মানব-মনের আদিম শত্রুটি দ্বিতীয় শত্রুটিকে পরাভূত করিয়া ফেলিল।

খোকা গম্ভীর ঐচ্ছিক স্বরে বলিলেন, আমার ইচ্ছে, আমরা এক পথেই চলি।

শৈলী একান্ত বিনীত ও অনুগত আবশ্যিক স্বরে বলিলেন, আমারও।

জুলাই, ১৯৪০

কনে

১

নিকুঞ্জবাবুকে পটলডাঙ্গা অঞ্চলে সকলেই চেনে। কলিকাতায় তাঁহার পাঁচখানি বাড়ি। চারিখানি একেবারেই ভাড়া দেওয়া আছে। সবচেয়ে ছোট যেখানি, সেখানিরও অধিকাংশ ইট, কাঠ, টিন এবং চট, এই চরি প্রকারের পার্টিশন দ্বারা নানা ভাগে ভাগ করিয়া ভাড়া দেওয়া হইয়াছে। অবশিষ্ট অংশের তিনখানি ঘরে স্বয়ং, মাতৃহীনা একমাত্র পুত্র এবং একটি স্কন্ধারূঢ় ভাইপোকে লইয়া বাস করেন। পাড়ার লোক তাঁহাকে কৃপণ ইত্যাদি বলে, আবার শ্রদ্ধা-ভক্তিও করে।

পুত্রটি মাঝারি, অর্থাৎ সববিষয়েই মাঝারি। আকারে মাঝারি, বর্ণে মাঝারি, বুদ্ধিতে মাঝারি, পড়াশুনায় মাঝারি, স্বাস্থ্যে মাঝারি। কিন্তু স্বভাবটির জন্য সে বাড়িতে এবং বাড়ির বাহিরে সকলেরই একান্ত আপনার জন হইয়া উঠিয়াছে। ভাইপোটি কিন্তু খুব স্মার্ট। সমবয়সী হইলেও সে সর্বদাই তাহার জেঠতুতো ভাইটিকে নাবালক বলিয়াই মনে করে এবং সর্বদা সর্ববিষয়ে তাহাকে আদেশ ও উপদেশ দিয়া মানুষ করিয়া তুলিতে চেষ্টা করে। উভয়েরই মনটি ভাল। সুতরাং সমস্ত বিষয়েই ভিন্ন রুচি ভিন্ন স্বভাব সত্ত্বেও উভয়ে উভয়কে অন্তরের সহিত ভালবাসে। এবার তাহারা দুজনেই বি. এ. পাস করিয়াছে। পুত্রটি দ্বিতীয় বিভাগে অনার্স পাইয়াছে, ভাইপো ডিস্‌টিংশনে পাশ করিয়াছে।

নিকুঞ্জবাবুর ইচ্ছা, পুত্রের বিবাহ দিয়া বহুদিনের শূন্য গৃহ পূর্ণ করেন। ভাইপো বলেন, এখুনি বিয়ে কিসের? বি. এ. পাশ ক'রে

বিয়ে করা আজকাল উঠে গেছে। জেঠামহাশয় বলেন, আমি সেকেলে লোক, সেকেলে মতেই ছেলের বিয়ে দেব। ছেলে স্বয়ং কিছুই বলে না। তাহার মত মাঝামাঝি ; বিয়ে হলে মন্দ কি ? না হয় তো ব'য়েই গেল।

ঘটক আনাগোনা করিতে লাগিল। ঘর পছন্দ হয় তো মেয়ে পছন্দ হয় না, মেয়ে পছন্দ হয় তো ঘর পছন্দ হয় না। জেঠামহাশয়ের হয়তো মত হয়, ভাইপো বাঁকিয়া বসেন। ভাইপোর যদি পছন্দ হয়, জেঠামহাশয় বলেন, ও সব মেয়ে আমার বাড়িতে মানাবে না। ছেলে সব শোনে, কিন্তু জোর করিয়া কিছু বলে না।

একদিন ঠিক হইল, শ্যামপুরের একটি মেয়েকে দেখিতে যাইতে হইবে। ছেলে বলিল, তোমরাই আজ যাও, আমি যাব না। ভাইপো পাড়ার একটি বন্ধুকে ডাকিয়া আনিয়া বলিল, চল, মেয়ে দেখে আসি। সঙ্গে একখানা নোটবুক নে। সব ডিটেল্‌স চটপট টুকে নিবি, বুঝলি ? আর শোন, একটা মাপবার ফিতেও নিস পকেটে।

বন্ধু বলিল, এই আমি আসছি কাপড়টা বদলে।

২

ওদিকে শ্যামপুকুরে একটি ছোট গলির মধ্যে, একখানি ছোট দোতলা বাড়ির নীচের তলায়, সামনের ঘরখানি একটু ঝাড়িয়া-ঝুড়িয়া পরিষ্কার করা হইয়াছে। গড়ে মাসে দুই তিন বার এরূপ করা হইয়া থাকে। কারণ, মেয়ে বড় হইয়াছে, তাহাকে মাঝে মাঝে দেখিতে তো আসিবেই। চারিখানি চেয়ারের মাঝে একটি কাপড়-ঢাকা টিপয়। পাশে একখানি তক্তাপোষ, তাহার উপর শতরঞ্জি এবং একখানি রঙিন সুজনি। দুইটি বিভিন্ন আকারের তাকিয়া—পরিষ্কার ওয়াড়-পরানো।

দেওয়ালের গায়ে যথারীতি কয়েকখানি ফোটো, কয়েকখানি বাঁধানো উলের কাজ, এবং একখানি ইংরেজী-বাংলা-মিশানো ক্যালেণ্ডার। ভিতরের দিকের দরজার পাশে, পর্দার নীচে একটি কালো কুকুর আধ ইঞ্চি জিব বাহির করিয়া ঝিমাইতেছে। কনের দাদা এবং পিসতুতো ভাই, কনের সঙ্গে সঙ্গে আসন্ন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। পিসতুতো ভাইটি একটি ছোট ফুলদানি আনিয়া টিপয়ের উপর রাখিয়া দিলেন।

প্রথম প্রথম আগন্তুকদের জন্য নানারূপ আহার্যের ব্যবস্থা করা হইত। দুই তিন রকম ফল, দুই এক রকম ঘরে তৈয়ারি ছানা বা ক্ষীরের খাবার, দুই এক রকম নোনতা খাবার, দুই তিন রকম মিষ্টান্ন, লুচি, হালুয়া, আলুর দম, মাছ বা তরকারির চপ, আর তাহার সঙ্গে চা, শরবৎ, সিগারেট প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হইত। কিন্তু কিছুদিন পরেই দেখা গেল, এই রেটে চলিলে শুধু জলখাবার যোগাইতেই কন্যাপক্ষকে ফতুর হইতে হইবে। অনেকবার এমনও হইল যে, সমস্ত আয়োজনের পর শোনা গেল, কোন একটা তুচ্ছ অজুহাতে, যাঁহাদের আসিবার কথা ছিল, তাঁহারা কেহই আসিলেন না। সুতরাং এখন আর অতদূর বাড়াবাড়ি করা হয় না। উপস্থিতমত কিছু নোনতা আর মিষ্টি খাবার এবং চা, ইহারই ব্যবস্থা আছে। পরে উভয় পক্ষের আগ্রহের তারতম্য অনুসারে আদর-আপ্যায়নের মাত্রাও কম বেশি করা যাইতে পারিবে।

কনে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে। সে কিছুতেই সাজিতে চায় না। যাহা পরিয়া সে কলেজে যায়, তাহা ছাড়া আর কিছুই পরিবে না। অনেক সাধ্যসাধনার পর শুধু শাড়িখানি বদলাইতে এবং কানে দুল পরিতে রাজি হইয়াছে। তাহা ছাড়া ঠিক কলেজের পোষাকই আছে। নীচু-গোড়ালি স্ট্র্যাপ-দেওয়া জুতা, পুরা-হাতা অ্যান্টি-টন্‌সিল-কলার-ওয়ালা ব্লাউজ,

আধ-এলো খোঁপা আর সরু কয়গাছি চুড়ি। অনেক বলিয়া কহিয়া বউদির লকেট-হারগাছিও পরানো হইয়াছে। স্নো, পাউডার, রুজ, লিপষ্টিক—কিছুই ব্যবহার করিতে রাজি করা গেল না। দেখিলেই অভিনেত্রী বলিয়া ভুল করিবার কোন আশঙ্কাই রহিল না।

৩

জেঠামহাশয়, ভাইপো এবং বন্ধু যথাসময়ে যথাস্থানে উপস্থিত হইলেন। কনের দাদা এবং পিসতুতো ভাই দরজার কাছেই ছিলেন। তাঁহারা সবিনয় অভ্যর্থনা জানাইয়া আগন্তুকদিগের ঘরের ভিতর লইয়া গিয়া বসাইলেন। যথারীতি কুশলপ্রশ্নাদির পর চা এবং জলখাবার আনা হইল। ভাইপো এবং বন্ধু দ্বিরুক্তি না করিয়া খাবারগুলি নিঃশেষ করিলেন। জেঠামহাশয় অনেক অনুরোধ-উপরোধের পর একটি সন্দেশের এক কোণ হইতে একটি টুকরা ভাঙিয়া লইয়া মুখে দিলেন।

চা-পান শেষ হইতেই ভাইপো বলিলেন, এবার তা হ'লে মেয়েটিকে—

জেঠামহাশয় বলিলেন, দেখুন, বেশি পাউডার-টাউডার মাখাবেন না। মানে—আমরা সেকেলে লোক কিনা—

কনের পিসতুতো ভাই 'আজ্ঞে, ওসব সেকেলেরাই বেশি মাখে' বলিয়া বাড়ির ভিতরে চলিয়া গেলেন এবং পরক্ষণেই বোনটিকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া তক্তাপোশের উপরে একপাশে বসাইয়া দিলেন। মেয়েটি আগন্তুকদিগকে লক্ষ্য করিয়া গোটা দুই তিন ছোট্ট নমস্কার করিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল।

জেঠামহাশয় বলিলেন, তোমার নামটি কি মা?

মেয়েটি। বনলতা।

জেঠামহাশয়। বেশ নামটি, সেকেলেও নয়, আবার একেলেও নয়।

ভাইপো। কি পড় ?

মে। ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি।

ভা। আই. এ. না আই. এস-সি. ?

মে। আই. এস-সি.।

জে। একটু এদিকে এস তো মা। দেখি তোমার চুল।

পিসতুতো ভাই। (চুল খুলিয়া) এর চুল খাসা।

ভা। (বন্ধুর প্রতি) দেখি ফিতেটা। (ফিতা দিয়া চুল মাপিয়া) লেখ, চুল—চুয়াল্লিশ ইঞ্চি।

জে। আচ্ছা মা, দেখি তোমার পা দুখানি।

পি.-ভা। (পায়ের উপর হইতে শাড়ির পাড় সরাইয়া) এই দেখুন।

ভা। (ফিতা দিয়া মাপিয়া, বন্ধুর প্রতি) লেখ, পনরো ইঞ্চি।

বন্ধু। পনরো ইঞ্চি পা, বলিস কি ?

জে। মা, তোমার মামাবাড়ি কি শিলিগুড়ি ?

ভা। (বন্ধুর প্রতি) আরে ম'ল, পনরো বর্গ-ইঞ্চি—ছয়-বাই-আড়াই।

ব। তাই বল।

জে। আচ্ছা মা, তুমি রাঁধতে পার ?

মে। (ঘাড় কাত করিয়া) হ্যাঁ।

জে। কি কি রাঁধতে পার, বল তো ?

মে। সুক্ত, ভাজা, চচ্চড়ি, ঘণ্ট, ছ্যাঁচড়া, ডাল, মুড়িঘণ্ট, কালিয়া, টক, চাটনি, ফ্রাই, চপ, কাটলেট, পোলাও, কোর্মা, লুচি, হালুয়া, রুটি পরটা, খিচুড়ি, সন্দেশ, রসগোল্লা, জিলিপি, গজা, নিমকি, শিঙাড়া, সাবু, বার্লি, গ্ল্যাক্সো,—

জে। থাক, ওতেই হবে। (ভাইপোর প্রতি নিম্ন স্বরে) আমাদের বাজার-বরাদ্দ তো সাড়ে-সাত-আনা। (কনের প্রতি) আচ্ছা মা, তুমি স্তব-পাঠ করতে পার ?

মে। হ্যাঁ।

জে। একটু শোনাও তো।

মে। জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥

জে। বেশ। আচ্ছা, বল তো, পূজো করতে কি কি লাগে ?

মে। কুশাসন, জল, গোবর, কোশা, কুশি, ফুল, চন্দন, ধূপ, নৈবেদ্য, শঙ্খ, ঘণ্টা, প্রদীপ, পুঁথি, পুরুত, দক্ষিণা, চরণামৃত, সন্দেশ, দই—এই সব।

ভা। বেশ। আচ্ছা, বল তো, উপাসনা করতে কি কি লাগে ?

মে। ছাপা-চামড়ার স্যাণ্ডাল, ফরাসডাঙার ধুতি, আদ্দির পাঞ্জাবি, গরদের চাদর, সোনার চশমা, কাঁচা-পাকা দাড়ি, টাক, এক শত জন ছাত্র এবং এক শত এক জন ছাত্রী।

ব। বেশ। আচ্ছা, তুমি শেলাই করতে পার ?

মে। হ্যাঁ। (পিসতুতো ভাইয়ের দিকে চাহিতেই তিনি বাড়ির ভিতর গিয়া একটি বড় বোঁচকা লইয়া আসিলেন)

পি. ভা। এই দেখুন, এসব ওর হাতের জিনিস।

দেখা গেল, তাহার মধ্যে চটের উপর উলের কাজ-করা আসন, কার্পেটের উপর উল দিয়া লেখা কবিতা, ডি. এম. সি. সূতা দিয়া ফুল পাতা আঁকা রুমাল, এম্‌ব্রয়ডারি করা টেব্‌লক্লথ, সায়া, শেমিজ, ব্লাউজ, উলের মাফ্‌লার, উলের সোয়েটার, ছিটের ফ্রক, ইজের, লংক্লথের ফ্রিল দেওয়া বালিশের ওয়াড়, জানালার পর্দা প্রভৃতি রহিয়াছে।

এসব দেখিয়া জেঠামহাশয় তো অবাক। সবিস্ময় হাসি হাসিয়া বলিলেন, আচ্ছা মা, এতটুকু বয়সেই এত শেলাই শিখেছ?

ভাইপো বলিয়া উঠিলেন, আজকালকার মেয়েরা ওসব শিখেই থাকে।

সেকেলে জেঠামহাশয় অগত্যা অধিক বিস্ময়-প্রকাশ ও প্রশংসা চাপিয়া গেলেন।

বন্ধু অনেকক্ষণ চুপ করিয়া আছেন। এবার বলিলেন, আচ্ছা, তুমি ছবি আঁকতে পার?

জে। ছবি কি আর সবাই আঁকতে পারে?

ব। আজকালকার মেয়েরা সব পারে।

জে। আচ্ছা মা, তুমি কি ছবি আঁকতে পার?

মে। একটু একটু পারি। পেন্সিল আর জল-রঙ দিয়ে অনেকগুলো ছবি এঁকেছি। এবার ভাবছি, অয়েল-পেন্টিং শিখব।

ভা। তোমার চিত্রকলার ভাবটা কি অবনীন্দ্রীয়, না নন্দলালীয়?

মে। দুইই। আর তার সঙ্গে একটু হেমেন্দ্রীয় আর একটু টমাসীয় ভাবও আছে।

ভা। বেশ, বেশ। আচ্ছা, তুমি মাটির কিংবা প্ল্যাস্টারের মূর্তি গড়তে পার?

মে। অল্প অল্প পারি। পাল মশায়ের কাছে প্রায় এক বৎসর শিক্ষানবিসী করেছি।

ব। আচ্ছা, তুমি কবিতা লেখ?

মে। (একটু হাসিয়া) কখনও কখনও।

পিসতুতো ভাই এই সময় উঠিয়া গিয়া একখানি খাতা লইয়া আসিলেন। খাতাখানি কবিতা ভরা। জেঠামহাশয় খাতাখানি লইয়া খুলিয়াই বলিলেন, বাঃ, হাতের লেখা তো বেশ—মুক্তোর মত। বন্ধু

মহাশয় জেঠামহাশয়ের হাত হইতে খাতাখানি লইয়া কয়েকটি পৃষ্ঠার উপর চক্ষু বুলাইয়া বলিলেন, কবিতাগুলি তো বেশ।

ভা। আচ্ছা, তোমার কাব্যভাবটা কি মাইকেলীয়, না রবীন্দ্রীয়—মানে—সেকালীয়, না একালীয় ?

মে। লেখা দেখেই তো বুঝতে পারছেন।

ব। ঠিক ধরতে পারছি না। ভাষাটা প্রায় মাইকেলীয়, ভাবটা প্রায় রবীন্দ্রীয়, ছন্দটা রজনী-সেনীয়, আর আদর্শটা মনে হচ্ছে কুমুদ-মল্লিকীয়।

মে। তা হবে।

জে। তোমাদের ওসব কাব্য-কবিতার কথা এখন থাক। আচ্ছা মা, তুমি গান গাইতে পার ?

মে। (ঘাড় হেলাইয়া) হ্যাঁ।

ভা। কি কি ধরনের গান গাইতে পার ?

বে। সাধারণ সব রকমই একটু একটু পারি। যেমন, ক্ল্যাসিক্যাল, মডার্ন, রবীন্দ্রীয়, রামপ্রসাদী, হিন্দী, গজল, বৈঠকী, বোলপুরী, সভা-উদ্বোধনী, প্রাইজ-ডিষ্ট্রিবিউশনী, চাঁদা-আদায়ী—

জে। বেশ, বেশ। আচ্ছা মা, তুমি কীর্তন গাইতে পারে ?

মে। হ্যাঁ। কীর্তন, সংকীর্তন, হরিসংকীর্তন, কালীকীর্তন এই সব।

ভা। (জেঠামহাশয়কে, নিম্ন স্বরে) একটা কীর্তন গাইতে বলুন না।

জে। আচ্ছা মা, একখানা কীর্তন আমাদের শোনাবে ?

মেয়েটি পিসতুতো ভাইয়ের দিকে চাহিল। তিনি বলিলেন, একটা গান গেয়ে শুনিয়ে দাও।

এই কথা বলিয়া উঠিয়া গিয়া বাড়ির ভিতর হইতে একটি হার-মোনিয়ম আনিয়া মেয়েটির পাশে রাখিলেন। একটু থামিয়া, এদিক ওদিক একটু চাহিয়া মেয়েটি হারমোনিয়মে সুর দিল এবং একটু পরেই মিষ্ট স্বরে গাহিতে আরম্ভ করিল—

গান (সুর—মনোহরসাঁই)

সুখের লাগিয়া কলেজে পশিনু
সকলি ব্যরথ ভেল।
হেদুয়া তড়াগে সিনান করিতে
সরদি লাগিয়া গেল॥
সখি, কি মোর করমে লেখি—
সহজ ভাবিয়া সায়েন্স লইনু
ভীষণ কঠিন দেখি॥
বেথুন ছাড়িয়া স্কটিশে আসিতে
পড়িনু:পীরিতি-জালে।
না পেনু অনার্স না হইনু পাস
এই কি ছিল রে ভালে॥
যতন করিয়া পিছলি পড়িনু
মোটর-চাকার পাশে।
তবুও নিঠুর ফিরে না তাকাল
বিলেত পালাল শেষে॥
কত না আশায় দীরঘ দিবস
হোস্টেলে কাটিয়া গেল।
বুনিনু শুধুই স্বপনের জাল
সফল নাহিক ভেল॥

জে। বেশ, আচ্ছা মা, এগুলো কি তোমার নিজের কথা ?

মে। কি যে বলেন ! আমি কি কখনও স্কটিশে পড়েছি ?

জে। বাঁচালে মা, বাঁচালে।

ব। আচ্ছা, তুমি কি কি বাজনা বাজাতে পার ?

মে। হার্‌মোনিয়ম, এস্রাজ, সেতার, বেহালা, বাঁশী, ক্লারিওনেট, জলতরঙ্গ, তবলা, সানাই, কাঁসি, ঢাক, ঢোল, খোল, করতাল, পিয়ানো —এইসব।

জে। বেশ, মা, বেশ।

ভা। (জেঠামহাশয়কেই, নিম্নস্বরে) নাচতে পারে কিনা—একবার জিজ্ঞেস করুন না।

জে। আচ্ছা মা, তুমি নাচতে পার ?

মে। (ঘাড় কাত করিয়া) হ্যাঁ।

ব। (উৎসাহিত হইয়া) কি কি নাচ জান ?

মে। বল, ব্যালেট, বাঙ্গি, রবীন্দ্রীয়, প্রাচ্য, গুজরাটী, গুরুসদয়ী, ব্রতচারী, সাঁওতালী, মণিপুরী, মৈথিলী, কথাকলি, দ্রাবিড়ী, সিংহলী, হরেন-ঘোষী, উদয়শঙ্করী, ফার্স্ট-এম্পায়ারী, কাঠি, পোয়ে, ছউ— এইসব।

নাচের তালিকা শুনিয়া জেঠামহাশয়ের চক্ষু তো কপালে উঠিয়াছে। বন্ধুও পরম বিস্মিত ও তৃপ্ত হইয়াছে। কিন্তু ফার্স্ট-এম্পায়ারবিশারদ ভাইপোর ভাবটা এই—এ আর এমন আশ্চর্য কি! তিনি নিম্নস্বরে জেঠামহাশয়কে বলিলেন, জিজ্ঞেস করুন তো, বালিনীজ নাচ জানে কি না।

জেঠামহাশয় নিতান্ত অগত্যা জিজ্ঞাসা করিলেন, এরা জিজ্ঞেস করছে, তুমি বালিনীজ নাচ জান কিনা।

মে। হ্যাঁ। বালিনীজ, জাভানীজ, সুমাত্রানীজ, সেলিবেশনীজ, আর মালয়নীজ—এগুলো শেখা হয়ে গেছে ; এখন গ্রেটার-ইণ্ডিয়ানীজ শিখছি।

ভা। বেশ, বেশ।

জে। (ভাইপো এবং বন্ধুর প্রতি) নাও, সবই তো শুনলে। আর কিছু তো নেই জিজ্ঞেস করবার ?

ভা। না, আর কি জিজ্ঞেস করব ? (মেয়েটির প্রতি) আচ্ছা, তুমি সাঁতার কাটতে পার ?

মে। পারি।

ব। আচ্ছা, তুমি সাইকেল চড়তে পার ?

মে। (ঘাড় কাত করিয়া) হ্যাঁ।

ব। লাঠি খেলতে পার !

মে। ছোট লাঠি শিখেছি, বড় লাঠি এখনও শিখিনি।

ব। ছোরা ?

মে। অল্প অল্প পারি।

জে। নাও, এবার ওকে ছেড়ে দাও। সবই তো হ'ল।

ভা। (জেঠামহাশয়কে, নিম্নস্বরে) জিজ্ঞেস করুন না, ঘোড়ায় চড়তে পারে কিনা।

মে। (প্রশ্নটি শুনিয়া) দার্জিলিঙের ঘোড়ায় চড়েছি।

ভা। বেশ।

জে। আচ্ছা মা, এইবার এস।

মেয়েটি হাত তুলিয়া দুই তিনটি ছোট নমস্কার করিয়া খাট হইতে নামিয়া দাঁড়াইল, এবং পিসতুতো ভাই তাহাকে ধরিয়া বাড়ির ভিতরের দিকে পা বাড়াইলেন। এমন সময়ে ভাইপো বলিয়া উঠিলেন,

দেখুন, একটা কথা জিজ্ঞেস করতে ভুল হয়ে গেছে। কিছু মনে করবেন না।

পিসতুতো ভাই। না না, মনে করবার কি আছে? কি জিজ্ঞেস করছেন?

ভা। আচ্ছা, তুমি সুপুরি কাটতে পার?

মেয়েটি 'পারি' বলিয়াই বাড়ির মধ্যে চলিয়া গেল। তাহার পায়ের ধাক্কা খাইয়া দরজার নিকট কুকুরটি 'ঘেউ' করিয়া উঠিল।

ব। (পিসতুতো ভাইকে) দেখুন, একটা কথা, কিছু মনে করবেন না।

পি. ভা। না না, মনে করব কেন? বলুন।

ব। মেয়েটিকে আর একবার একটু আনতে হবে।

পি. ভা। কেন বলুন তো?

ব। দেখুন, নাকটা আর দাঁতগুলো ভাল ক'রে দেখা হয়নি।

পি. ভা। এতক্ষণ এখানে ব'সে ছিল, এত কথা বললে, গান করলে, তবু আপনাদের নাক আর দাঁত দেখা হ'ল না?

ব। দেখেছি, তবে—মানে, ভাল ক'রে দেখা হয়নি।

পি. ভা। আচ্ছা, নিয়ে আসছি।

পিসতুতো ভাই মহাশয় বাড়ির ভিতর গিয়া মেয়েটিকে আবার লইয়া আসিলেন।

ভা। (ফিতা লইয়া, নাক মাপিয়া) লেখ, ১·৬ ইঞ্চি।

ব। লিখেছি। (মেয়েটির প্রতি) আচ্ছা, একটু হাস তো।

মেয়েটি হাসিল কিনা বোঝা গেল না। তবে ওষ্ঠদ্বয় একটু ফাঁক হইতেই বন্ধু বলিলেন, যাক, ওতেই হবে। তারপরে নোটবুকে লিখিলেন, দাঁত ভাল।

পি. ভাই। আপনাদের কি আর কিছু জিজ্ঞেস করবার আছে?

জে। না, আমাদের আর কিছু জিজ্ঞেস করবার নেই।

পিসতুতো ভাই মহাশয় বোনটিকে লইয়া বাড়ির ভিতর চলিয়া গেলেন।

কনের দাদা বেশি কথা বলেন না। এতক্ষণ কিছুই বলেন নাই। এবার সভয়ে এবং সসম্ভ্রমে জেঠামহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, মেয়েটি কি আপনাদের পছন্দ হ'ল?

জেঠামহাশয় অতি উৎসাহে বলিতে যাইতেছিলেন, খুব পছন্দ হয়েছে। কিন্তু তাঁহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া ভাইপো বলিলেন, দেখুন, হঠাৎ তো মত দেওয়া যায় না। বাড়ি গিয়ে ভেবে চিন্তে দেখি, যদি আমাদের পছন্দ হয়, তা হ'লে একদিন মেয়েরা দেখতে আসবেন। মেয়েদের সম্বন্ধে মেয়েরাই ভাল বোঝে, বুঝলেন কি না। তারপর মেয়েদের যদি পছন্দ হয়, তখন ছেলে নিজে এসে দেখবে। আজ তো আর ভাল ক'রে দেখা হ'ল না, এটা একটি প্রিলিমিনারি দেখা, বুঝলেন কি না।

পিসতুতো ভাই বাড়ির ভিতর হইতে আসিয়া যথোচিত আপ্যায়ন দ্বারা অভ্যাগতদিগকে বিদায় দিলেন।

৪

মেয়েটি বাড়ির ভিতরে আসিয়াই হার, চুড়ি, জুতা, জামা সব ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। পিসতুতো বউদি কাছে আসিতেই তাহার গালে একটা চড় বসাইয়া দিল। পা দিয়া ধাক্কা দিয়া টুল, চেয়ার, মোড়া, যাহা সামনে পাইল, তাহাই দূরে ফেলিয়া দিল। দেওয়াল হইতে

ছবি, ক্যালেণ্ডার, আয়না প্রভৃতি টানিয়া ছিঁড়িয়া মাটিতে ফেলিয়া দিল। ব্যাপার দেখিয়া বাড়ির সকলে ছুটিয়া আসিয়া ধরিতে গেলে চড়, লাথি, কিল প্রভৃতি দিয়া তাহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। সকলে মিলিয়া জোর করিয়া ধরিয়া চোখে মুখে জলের ছিটা দিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দেওয়া হইল। পিসতুতো বউদি বলিলেন, কেন এমন হ'ল? ও তো কখনও এমন করে না। দাদা সভয়ে বলিলেন, হিস্টিরিয়া না তো?

ইতিমধ্যে বনলতা খাটের একপাশে উঠিয়া বসিয়া চীৎকার করিয়া বলিতে আরম্ভ করিল, হ্যাঁ, হিস্টিরিয়া। কেন হিস্টিরিয়া হবে না? আমাকে তোমরা কি ভেবেছ? আমি কি হাঁস, না মুর্গি, না খরগোস, না ঘোড়া? আমার নাক মাপবে, চুল মাপবে—এত বড় আস্পর্ধা? শুধু তোমাদের অপমানের ভয়ে আমি চুপ ক'রে ছিলুম। ফের যদি এমন ইডিয়টের দল বাড়িতে ডেকে আন তো, আমি আত্মহত্যা করব। মনে থাকে যেন।

বনলতা বিছানার উপর এলাইয়া পড়িল। পিসতুতো বউদি কপালে হাত বুলাইতে লাগিলেন। বনলতার চোখের কোণে এক ফোঁটা জল দেখা গেল। বউদি আঁচল দিয়া মুছাইয়া দিলেন।

৫

এদিকে জেঠামহাশয় বাড়ি ফিরিয়াই অপেক্ষমান আত্মীয়-স্বজনকে লইয়া বৈঠক জমাইয়া বসিলেন। বলিলেন, খাসা মেয়ে, এমন সর্বগুণ-সম্পন্না লক্ষ্মী লাখে একটা মেলে কি না সন্দেহ।

ভা। জেঠামহাশয়ের সবতাতেই একটা আ-দেখ্‌লে ভাব। আজ-

কাল অমন মেয়ের অভাব কি ? তবে হ্যাঁ—মেয়েটি ম-ন্-দ নয়—একথা বলা যেতে পারে।

ব। যাই বলুন, এ মেয়ে হাতছাড়া করা হবে না।

জে। ঠিক বলেছ, এমন মেয়ে কিন্তু আর পাওয়া যাবে না।

আত্মীয়। তা হ'লে এই অগ্রাণেই, কি বল ?

ভা। এত ব্যস্ত কি ? আরও দু চারটে দেখা যাক, মেয়েরা দেখুন, ছেলে নিজে দেখুক, দেনা-পাওনার কথা হোক, তবে তো ?

জে। অত-শতর মধ্যে আমি নেই। মেয়ে পছন্দ হয়েছে, বাস্। ছেলের মত ? ওর মত হবে, তা আমি লিখে দিচ্ছি। মোট কথা, এ মেয়ে হাতছাড়া করা হবে না। দেনা-পাওনা ? সেজন্যে তোমাদের ভাবতে হবে না।

আত্মীয়। ভায়া যে দাতাকর্ণ হয়ে উঠলে ?

জে। ঠাট্টা রাখ। এই অগ্রাণেই যাতে বিয়েটা হয়ে যায়, আপনারা তার উদ্যোগ করুন। আমি একটা দিন দেখে মেয়েকে আশীর্বাদ ক'রে আসব।

৬

পাঠকবর্গকে বিশেষতঃ পাঠিকাবর্গকে, একটু সান্ত্বনা দেওয়া দরকার। এমন একটা সর্বগুণসম্পন্না মেয়েকে আই. সি. এসের সঙ্গে বিবাহ না দিয়া লেখক ইহাকে একটা মাত্র বি. এ. পাস বেকার ছেলের সঙ্গে একটা কালচারহীন পরিবারে বিবাহের ব্যবস্থা করিতেছেন দেখিয়া ইঁহারা হয়তো শকড্ হইবেন। কিন্তু লেখক নিরুপায়। প্রজাপতি মহাশয় তো পাঠকবর্গের খাস তালুকের প্রজা নন যে, তাঁহাদের মন

যোগাইয়া চলিবেন! তা ছাড়া, কোন আই. সি. এস. বম্বে আসিয়া নামিলেই, ই. আই. আর. এবং বি. এন. আরের প্রত্যেক স্টেশনে এবং হাওড়া হইতে আরম্ভ করিয়া বালিগঞ্জ পর্যন্ত ধনী কন্যা-পিতৃগণের যে 'কিউ' রচিত হয়, তাহার মধ্যে প্রবেশ করা বনলতার আত্মীয়স্বজনের পক্ষে সম্ভব ছিল না। সুতরাং প্রজাপতির বর্তমান ব্যবস্থায় শকুড হইলে চলিবে না। আত্মীয়স্বজনের পরিচারিকাবৃত্তি, অনশনক্লিষ্ট মাস্টারিবৃত্তি, ধাত্রী ও অভিনেত্রীর বৃত্তি যাঁহাদের কাম্য নয়, তাঁহাদিগকে প্রজাপতির সহিত একটা সম্মানজনক আপোষ করিতেই হইবে।

৭

নিকুঞ্জবাবুর বাড়িতে বেশ একটু পরিবর্তন হইয়াছে। ভাড়াটিয়ারা সব একে একে উঠিয়া গিয়াছে। বাড়িটা আমূল সংস্কৃত ও পরিষ্কৃত হইয়াছে। নীচের দোকানঘর ভাঙিয়া গ্যারেজ হইয়াছে এবং তাহার মধ্যে একখানি চকচকে খুকীগাড়ি শোভা পাইতেছে। রেডিও লওয়া হইয়াছে।

বেকার পুত্রের বেকারত্ব ঘুচিয়াছে। নিকুঞ্জবাবু একটি আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায়ের মোটা শেয়ার পুত্রের নামে কিনিয়া তাহাকে উক্ত প্রতিষ্ঠানের অংশীদার করিয়া দিয়াছেন।

একদিন পুত্র বাড়ি আসিয়া দেখেন, বনলতা কাগজ পেন্সিল লইয়া একটা আঁক করিতেছে। পুত্র বলিলেন, কি হচ্ছে?

ডেসিম্যালের বিয়োগ করছি।

ডেসিম্যালের বিয়োগ?

হ্যাঁ।

মানে, ১·৯ – ১·৬ = ·৩।

অর্থাৎ?

অর্থাৎ, তোমার নাক মাইনাস আমার নাক—ইকোয়াল টু পয়েণ্ট থ্রী।

আচ্ছা, দেখি ভেরিফাই ক'রে, উত্তর ঠিক হ'ল কি না।

যাও।

সেপ্টেম্বর, ১৯৪০

প্রাণ ও ডাঁটা

১

ভরা বর্ষা। ভরা নদী। পদ্মার পাড়ে ভীষণ ভাঙন ধরিয়াছে। ছোট্ট একখানি গ্রাম। অনেক কষ্টে গত দুই তিন বৎসরের ভাঙনেও কোন মতে টিকিয়া আছে। এবার বুঝি আর নিস্তার নেই। দিবারাত্র পাড়ের নীচে কুলকুল, ঝুপঝুপ, ঝপাৎ-ঝপাৎ শব্দ চলিতেছে। কখনও কখনও এক একটা প্রকাণ্ড মাটির চাপড়া গাছপালা লইয়া নদীর বক্ষে ধ্বসিয়া পড়িতেছে।

পাশাপাশি দুইখানি ছোট বাড়ী। পুরুষানুক্রমে পরস্পরের সুখ-দুঃখের সাথী। বন্ধুত্ব, বিবাদ, প্রীতি, ঈর্ষা, সবই আছে, তবু তারা পরস্পরের কাছে একান্তই আপনার জন।

একদিন সন্ধ্যা হয় হয়। এ-বাড়ীর রমেশ আর ও-বাড়ীর গণেশ পদ্মার পাড়ে বসিয়া গল্প করিতেছে। আর কয়দিন যদি এমনি ভাবে ভাঙন চলিতে থাকে, তাহা হইলে কি উপায় হইবে, তাহাই আলোচনা করিতেছে। গণেশ উঠিয়া গিয়া জলের আরো কাছে গিয়া বসিয়া, রমেশকে ডাকিল, 'এখানে আয়'। রমেশ বলিল, 'সাবধান কিন্তু।'

এই কথা বলিতে বলিতেই একটা মাটির চাপের সঙ্গে গণেশ ঝপাং করিয়া জলে পড়িয়া গেল। রমেশ জানিত, গণেশ সাঁতার জানিলেও, সম্প্রতি গুরুতর অসুখ হইতে উঠিয়াছে বলিয়া গায়ে একটুও বল নাই। তাহাকে বাঁচাইবার জন্য সে তৎক্ষণাৎ জলে ঝাপাইয়া পড়িল এবং

বহুক্ষণ বহু চেষ্টা করিয়া গ্রাম হইতে প্রায় এক মাইল দূরে অর্ধমৃত অবস্থায় তাহারা তীরে উঠিল।

প্রায় অচেতন গণেশ একটু সুস্থ হইতেই বলিল, তোর জন্যই আজ আমি প্রাণ ফিরে পেলাম।

থাম। আর বক্তৃতা ক'রতে হবে না। এখন চল আস্তে আস্তে বাড়ী যাই। অন্ধকার হয়ে গেছে।

রমেশ আর গণেশের বিচ্ছেদহীন বন্ধুত্ব ক্রমশঃ গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতে লাগিল।

২

পঁচিশ বছর পরে। বেলা সাড়ে আটটা। মাণিকতলার বাজার। আধখোলা মণিব্যাগ হাতে রমেশ। পিছনে গামছা কাঁধে চুপড়ি আর চটের থলে হাতে চাকর। তরকারীর বাজারে এক দোকানে লাল ডাঁটার ঝাড় দেখিয়া, সেখানে গিয়া এক ঝাড় ডাঁটা হাতে লইয়া রমেশ বলিল, কত ?

চার পয়সা।

এক ঝাড় ডাঁটা চার পয়সা কিরে ?

আজ্ঞে, এ বাঁকড়োর ডাঁটা। ভারি মিষ্টি। চিবিয়ে যখন খাবেন, বুঝতেই পারবেন না ডাঁটা চিবুচ্ছেন না আখ চিবুচ্ছেন।

তাই নাকি ? সে যাই হোক, দু'পয়সায় দিবি ?

আজ্ঞে না, বাবু।

তবে রইল তোর ডাঁটা।

রমেশ ডাঁটা রাখিয়া অগ্রসর হইল। পিছনে গামছা কাঁধে চুপড়ি আর থলে হাতে চাকর চলিল।

গণেশও আসিয়াছে বাজার করিতে। ছাতা বগলে, থলে হাতে। লাল ডাঁটার ঝাড় দেখিয়া, একটি ঝাড় হাতে তুলিয়া বলিল, কত?

চার পয়সা।

এক ঝাড় ডাঁটা চার পয়সা কি রে?

আজ্ঞে, বাঁকড়োর ডাঁটা; ভারি মিষ্টি। খাবার সময়ে মনে হবে, যেন ল্যাবেঞ্চুস খাচ্ছেন।

তাই নাকি? সে যাই হোক, দু'পয়সায় দিবি?

আজ্ঞে না বাবু। আমার কেনাই পড়েছে সাড়ে তিন পয়সা।

গণেশ এবং তার স্ত্রী উভয়েই ডাঁটা খুব ভালবাসে। আজ আরো বেশি ভালবাসিবার কথা। কারণ আজকার মেনুতে মাছ নাই। মিষ্টি ডাঁটা অনেকক্ষণ ধরিয়া চিবাইয়া চিবাইয়া খাওয়া যায়, কাজেই খুব সুবিধা। গণেশ বলিল, নে বাপু, তিন পয়সার কমে যখন দিবিই নে।

এই কথা বলিয়া, তিনটি পয়সা রুমালের খুঁট হইতে বাহির করিয়া দোকানীর হাতে দিয়া, ডাঁটার ঝাড়টি ছাতার সঙ্গে বগলে ফেলিয়া অগ্রসর হইল। একটু গিয়াই রমেশের সঙ্গে দেখা। গণেশ বলিল, 'আরে, রমেশ যে!'

হ্যাঁ, এই মাস খানেক হ'ল ক'লকাতায় বদলি হয়েছি। সব ভাল তো?

চলে যাচ্ছে। আমার আর ভাল মন্দ। তোর সব খবর ভাল?

হ্যাঁ।

রমেশ ইতিমধ্যে গণেশের বগলে তাহারই দর-কৃত ডাঁটার ঝাড়টি লক্ষ্য করিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল, ডাঁটার ঝাড়টা কত নিলে?

তিন পয়সা।

স্রেফ ঠকিয়েছে—বলিয়া রমেশ অগ্রসর হইল।

ইহার পর নাকি রমেশ গণেশের সঙ্গে কখনও কোন দিন বাক্যালাপ করে নাই।

প্রাণ পণ করিয়া একদিন যে বন্ধুত্ব-সৌধ গড়িয়া উঠিয়াছিল, পঁচিশ বৎসর পরে দু'পয়সার এক ঝাড় ডাঁটার আঘাতে তাহা ধূলিসাৎ হইবে, ইহাও কি সম্ভব?

এপ্রিল, ১৯৪১

তৃতীয় বৈঠক

মজলিস বসিয়াছে। আলোকনিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা এবং বিবেকরক্ষার ব্যবস্থা পূর্ববৎ। বিবেকরক্ষী ড. নন্দী।

ড. নন্দী। আপনারা আজও আমাকেই বিবেকরক্ষিত্ব করতে অনুরোধ ক'রেছেন, এজন্য আমি খুবই সম্মানিত মনে ক'রছি, যদিও আমি জানি, এ সম্মানের যোগ্য আমি নই।

ড. দাস। সে কি কথা! আপনি সর্বতোভাবে একাজের পক্ষে যোগ্য ব্যক্তি। গত মজলিসে আমাকে একটু রূঢ় হ'তে হয়েছিল, সেজন্য আমি অতি দুঃখিত।

ড. নন্দী। না, না, সে কি! আপনি কেন কুণ্ঠিত হচ্ছেন! আমি সেদিন আপনাকে ভুল বুঝবার উপক্রম করেছিলাম, সেজন্য আমিই দুঃখিত। আশা করি, আপনি সেটা মনে ক'রে রাখবেন না।

মিস ঘোষ। আপনাদের ও সরি-হওয়া-হওয়ি এখন থাক। ও সব বিলিতি আদিখ্যেতা আমার ভাল লাগে না। (আলো—৫০)

ড. মুখার্জি। আমাদের আলোচনার আরম্ভ ব্রহ্মে—আশা করি আপনাদের মনে আছে। (আলো—৭০)

ড. নন্দী। হ্যাঁ, আজ ড. চৌধুরীকে ব'লেছি আসতে। তিনি ব্রহ্মত্ব-লাভের উপায় সম্বন্ধে একটা টক দেবেন।

মিসেস ভৌমিক। এ সব মজলিসে ও সব বক্তৃতা—

ড. নন্দী। এক্স্‌কিউজ্‌ মি, বক্তৃতা নয়, টক—

মিসেস ভৌমিক। ঐ একই কথা। ওসব শুকনো তত্ত্বকথা সব সময়ে ভাল লাগে না।

ড. নন্দী। কিন্তু লাগতেই হবে। আমাদের এ মজলিসটা তো আর একটা ক্লাব নয়, এটা একটা হায়আর ইন্‌টেলেকচুয়াল কালচারাল সেণ্টার, মানে—

ড. বোস। মানে তো আমাদের জানাই আছে! মিসেস ভৌমিক আরো কয়েকটি মজলিসে এলেই আমাদের ইনার স্পিরিটটা ধ'রে ফেলতে পারবেন।

এই সময়ে ড. দাস মজলিসে প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে একটি মহিলা। ইঁহার পরণে সাদা জর্জেটের শাড়ী, পায়ে সাদা ভেলভেটের স্যাণ্ডাল। সাদা সায়া, সাদা ব্লাউজ। হাতে সাদা হ্যাণ্ডব্যাগ। কব্জিতে সাদা ষ্ট্র্যাপ দিয়া বাঁধা হাতঘড়ি। গায়ের সাদা পরিচ্ছদ গায়ের বর্ণের সহিত অপূর্ব কণ্ট্র্যাস্ট সৃষ্টি করিয়াছে। সিঁথিতে দীর্ঘ উজ্জ্বল সিন্দূরের রেখা।

ড. বোস। (জনান্তিকে) এ কি! এ যে সিন্দূরবিন্দুবিধবাললাটে!

ড. নন্দী। এই যে আসুন ড. দাস। আপনার সঙ্গে ইনি—

ড. দাস। হ্যাঁ, ইনি আমার স্ত্রী। সম্প্রতি বিধবা হয়েছেন।

মজলিসের সকলেই পরস্পরের প্রতি মুখচাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিলেন এবং জিজ্ঞাসুনেত্রে ড. দাসের প্রতি চাহিতে আরম্ভ করিলেন।

(আলো—৫০)

ড. দাস। আপনারা একটু বিস্মিত হয়েছেন বলে মনে হচ্ছে!

ড. মুখার্জি। একটু হয়েছি বৈ কি! তবে খুব বেশি নয়।

ড. বোস। একটু এক্‌স্‌প্ল্যানেশন—মানে—ব্যাপারটা ঠিক ধরতে পারছি নে।

ড. দাস। মানে, আমি ওঁর ব্যবহারিক স্বামী। আমি বেঁচে রয়েছি, কাজেই মাথায় সিন্দুর রয়েছে। আর ওঁর মানস স্বামী, মিঃ—

ড. নন্দী। দেখুন, মানস স্বামী আর মানসী স্ত্রীর নামটা এ মজলিসে না বললেই ভাল হয়।

ড. দাস। বেশ, এগ্রীড। ওঁর মানস স্বামী সম্প্রতি মারা গেছেন, তাই ওঁর বিধবার বেশ।

ড. বোস। তা বেশ। রীজ্‌নের সঙ্গে সেন্টিমেন্টের এমন চমৎকার কম্প্রমাইজ বড় একটা দেখা যায় না।

মিসেস দাস। ড. নন্দী, এক গ্লাস জল আনাতে পারেন? একটু তেষ্টা পেয়েছে।

ড. নন্দী। নিশ্চয়ই।—বয়! এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি লে আও।

মিসেস দাস। কিছু মনে করবেন না। আমি কিন্তু বিধবাবস্থায় নীচ জাতের হাতের জল খেতে পারব না।

ড. নন্দী। সরি, কিন্তু আমার বাড়ীতে তো উচ্চবর্ণের চাকর নেই। তাহলে বরং একটা ডাব—

মিসেস দাস। সেও তো কাট্‌বে ওই বয়, সুতরাং—

ড. নন্দী। তাহলে একটা লেমনেড?

মিসেস দাস। হ্যাঁ, তা চল্‌তে পারে। লেমনেড বোতলে থাকে কিনা। শিশি বোতলে যা থাকে, সে তো ওষুধ। ওষুধের বেলায় কোন দোষ নেই।

ড. নন্দী। এক কাপ চা খাবেন?

মিসেস দাস। না, থ্যাঙ্ক্‌স্‌।

ড. নন্দী। আচ্ছা, একটা হাফ্‌-বয়েল্‌ড্‌ ডিম?

মিসেস দাস। না, থ্যাঙ্ক্‌স্‌। আমি আজকাল নিরামিষ খাই।

ড. বোস। আচ্ছা, আপনাদের কাছে ডিম আমিষ, অথচ দুধ নিরামিষ, এর মানে কি? দুটোই তো প্রাণীর গা থেকে বেরোয়।

ড. ভট্টাচার্য। জিনিষটা ঠিক ওভাবে দেখলে চলবে না। আহার্য দ্রব্যের সঙ্গে মনের সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ। দুধটা সাত্ত্বিক আহার। আর ডিমটা রাজসিক বা তামসিক। তাছাড়া ডিমের চেয়ে দুধ ঢের বেশী সুপাচ্য। এই সব কারণেই—

ড. বোস। ঘি গরম-মসলা দিয়ে রাঁধা ছোলার ডালের চেয়ে চুনোমাছের ঝোল ঢের বেশি লঘুপাক—তবু চুনোমাছ কিন্তু নিরামিষ নয়। (আলো—৩০)

ড. ভট্টাচার্য। আপনারা ওসব বুঝ্‌বেন না। ও তর্ক এখন থাক।

ড. নন্দী। তর্ক থাক। কিন্তু মিসেস দাসের বোধ হয় এ বৈধব্যব্রত সহ্য হচ্ছে না। বলছেন বটে, তেষ্টা পেয়েছে—আমার মনে হয়—খিদেও পেয়েছে। আপাতত একটা লেমনেডই হোক। আমি দেখছি, কিছু ফলটল—

মিসেস দাস। আপনি ব্যস্ত হবেন না। এখন আমি আর কিছু খাব না।

মিসেস ভৌমিক। আচ্ছা মিসেস দাস, আমার সে প্রস্তাবটার কি হ'ল? আপনার ছেলেটির মত জানতে পারলেন?

মিসেস দাস। বলেছি বৈ কি। সে কিছুতেই ডলিকে বিয়ে করতে চায় না।

মিসেস ভৌমিক। কেন, আমার মেয়েকে অপছন্দ করবার কি কারণ থাকতে পারে, আমি তো বুঝতে পারি না।

মিস্ চ্যাটার্জি। এ সব পছন্দ অপছন্দর মাঝে আপনারা থাকেন কেন। ওঁয়ারা নিজেরাই তো সব ঠিক ক'রে নিতে পারেন।

মিসেস দাস। একটু ক'রতে হয় বৈ কি। ছেলেরা কি আর অমনি অমনি মত করে বসে থাকে?

মিস্ চ্যাটার্জি। আমি ওসব বুঝি নে। যার গরজ থাকে, সে আপনি পায়ে এসে পড়্বে?

মিসেস ভৌমিক। তা যাই বলুন, একটু দেখে শুনে দিতে হয় বৈ কি! এই তো দুবছর ধরে ডলির জন্য কতগুলো ছোঁড়া ঘুর ঘুর ক'রে বেড়াচ্ছে। আমার তো পছন্দ হয় না।

মিস্ চ্যাটার্জি। ডলি কি বলে?

মিসেস ভৌমিক। সে কিছুই বলে না। দিন রাত বইতে মুখ গুঁজে পড়ে আছে।

মিস্ চ্যাটার্জি। আচ্ছা, মি. এম্. এন্. ব্যানার্জির ভাইপোটিকে আপনার কেমন লাগে। আমার সঙ্গে খুব আলাপ আছে। বলেন তো, আমি ইন্ট্রোডিউস করে দিতে পারি।

মিসেস ভৌমিক। ওঁরা বড্ড সেকেলে।

মিস্ চ্যাটার্জি। বলেন কি! ওরা তো সাহেবী পোষাক ক'রে বেরোন, হোটেলে খান, ওঁর স্ত্রী নিজে মোটর চালান, ওঁর মেয়েরা পার্টিতে গান গায়, নাচে—ওঁরা সেকেলে?

মিসেস ভৌমিক। শুধু ওসবে কি আর মডার্ন হওয়া যায়? সোশ্যাল আউটলুক উদার হওয়া চাই।

মিস্ চ্যাটার্জি। ওদের তো আমি উদার বলেই জানি। সেবার একটা বিধবা-বিবাহে উনি কত সাহায্য করলেন। অসবর্ণ বিয়েতেও ওঁদের মত আছে শুনেছি।

মিসেস ভৌমিক। ওসবে কি আর সেকেলে ভাব কাটে? এই তো সেদিন ড. চক্রবর্তীর বাড়ীতে মিসেস ব্যানার্জির সঙ্গে দেখা। বললুম, চলুন একদিন রেসে যাই—সেখান থেকে "প্যালেসে" একটু নেচে,

খেয়ে দেয়ে বাড়ী ফেরা যাবে। শুনে এমন একটা মুখের ভাব ক'রলেন, যেন আমি কি একটা ভয়ানক অন্যায় প্রস্তাব করেছি। (আলো—২০)

মিসেস চ্যাটার্জি। তা দেখুন, নাচা আর রেস খেলা—এ না হ'লে মডার্ন হওয়া যায় না, তা আমি মানি নে।

মিসেস ভৌমিক। সে যাই বলুন, আমি অমন গোঁড়া ঘরে মেয়ে দেব না।

ড. বোস। আমারও সেই মত।

মিসেস ভৌমিক। আচ্ছা, ড. বোস, একটা ব্যাচিলর পেরফেচার-টেরফেচার জানা নেই ? আমার কিন্তু পেরফেচার-জামাই ভারি পছন্দ। কেমন বেশ বোকা-বোকা !

মিস্ চ্যাটার্জি। তারা যদি রেসে না যায় ?

মিসেস ভৌমিক। তাদের যাওয়া না যাওয়া নির্ভর করবে আমার মেয়ের খুসীর উপর—তাদের নিজের ইচ্ছের উপর নয়।

ড. নন্দী। দেখুন, আলো বড় কমে গেছে। আমাদের আলোচনাটা একটু উপরের দিকে তুললে হ'ত। (আলো—২০)

ড. মুখার্জি। আচ্ছা—গীতার তো অনেকগুলো সংস্করণ আছে—আপনাদের কাছে কোনটা ভাল বলে মনে হয় ? (আলো—৪০)

ড. ভট্টাচার্য। সংস্করণে কিছু আসে যায় না। এখানে দরকার সব চেয়ে বেশি পাঠকের সংস্কার আর একটু নিষ্ঠা। (আলো—৫০)

ড. মুখার্জি। এত বই পড়লুম, এমন একখানা বই কিন্তু আর দেখলুম না। যে কোন মতের, যে কোন লোকের কাছেই এটা ধর্মচিন্তার একটা অফুরন্ত ভাণ্ডার। (আলো—৬০)

ড. পালিত। এই সম্পর্কে একটা প্রশ্ন আমার মনে হচ্ছে। আচ্ছা, গীতাপাঠ, চণ্ডীপাঠ, মন্ত্রজপ, এগুলো বুঝে, ভেবে, তন্ময় হয়ে যাঁরা করেন

বা করবার চেষ্টা করেন, তাঁদের একটা প্রিন্‌সিপ্‌ল্‌ বা আইডিয়াল অনুমান করা যায়। কিন্তু যাঁরা শুধু মেক্যানিকালি কতকগুলো অনুষ্ঠান পালন করে যান, তাঁদের কি সত্যই কোন লাভ হয়—না ওসব শুধু সময়ের অপব্যয় আর আত্মপ্রবঞ্চনা ?

ড. ভট্টাচার্য। তন্ময় হয়েই হোক, আর অন্যমনস্ক হয়েই হোক, ক্যাস্টর অয়েল খেলে তার ফল হবেই। তেমনি তন্ময় হয়েই হোক, আর অন্যমনস্ক হ'য়েই হোক, জপধ্যানের ফল ফলবেই। (আলো—৪০)

ড. মুখার্জি। আমি তা বিশ্বাস করিনে। শরীরের ধর্ম আর মনের ধর্ম আলাদা। ডন, বৈঠক করবার সময়ে একটু অন্যমনস্ক হ'লে শরীরের পেশীর বিশেষ ক্ষতি না হ'তে পারে, কিন্তু জপের সময়ে মোকদ্দমার চিন্তা ক'রলে মনের ক্ষতি নিশ্চয়ই হবে।

ড. পালিত। আমারও তাই মনে হয়। আনুষ্ঠানিক ধর্মের বাড়াবাড়িটা সাধারণত মনের উৎকর্ষ বা উদারতার বিরোধী বলেই মনে হয়। এই দেখুন না, রাসবিহারী ঘোষ, তারকনাথ পালিত, প্রফুল্লচন্দ্র রায়—এদের বিরাট দানের পিছনে আনুষ্ঠানিক ধর্মপালনের কোন প্রেরণা নেই।

ড. বোস। আমার মনে হয়, দান-ফান একটা দুর্বলতা—মনের অসংযমের পরিচায়ক। ধার্মিক ব্যক্তিরা সকল বিষয়েই সংযম অভ্যাস ক'রে থাকেন। তাঁরা কোন কিছুরই অপব্যয় করেন না। শরীর এবং মনের কোনরূপ অপচয় ধর্ম-বিরুদ্ধ। তাঁরা সর্বদা নীর থেকে ক্ষীর, অজ্ঞান থেকে জ্ঞান, ছায়া থেকে কায়া, অপব্যয় হতে সদ্ব্যয়, ক্ষয় হতে অক্ষয়, মৃত্যু হতে অমৃত আহরণ করে থাকেন। এই জন্যই, যখন দেখা যায় যে একশত আট বার মন্ত্র উচ্চারণ করলেই চিত্তশুদ্ধি হয়, তখন এই চিত্তশুদ্ধির উদ্দেশ্যে এক টাকা এগার আনা খরচ করার পক্ষে কোন

সুযুক্তি নেই। যাঁরা প্রকৃত ধার্মিক, তাঁরা আহার, বিহার, গাড়ী, ঘোড়া, সভা, সমিতি, হাসপাতাল, ধর্মশালা, আত্মীয়-স্বজন, প্রভৃতি নশ্বর বস্তু উপেক্ষা ক'রে অবিনশ্বর বাড়ী, অলঙ্কার, কোম্পানির কাগজ, শেয়ার, জমিদারী প্রভৃতিতেই তন্ময় হয়ে থাকেন।

মিস ঘোষ। আপনাদের ও সব ধর্মতত্ত্ব এখন থাক। আচ্ছা, একদিন একটা ভাল সিনেমায় গেলে হয় না?

মিসেস ভৌমিক। বেশ তো। কোথায় যাবেন, বলুন।

মিস ঘোষ। একটা ভাল বাংলা ছবিতে গেলে হয়।

মিসেস ভৌমিক। রাবিশ! বাংলায় ছবি হয় নাকি? তার চেয়ে চলুন একদিন মেট্রোয়—কিংবা—লাইটহাউসে—

মিস ঘোষ। বই পড়া না থাকলে, অধিকাংশ ইংরেজী ছবির অর্ধেক বোঝা যায় না, কথাবার্তা তো নয়ই।

ড. বোস। ছবি দেখা তো খালি গল্প আর কথার জন্য নয়! একটু বেশি দামে টিকিট কেনা, জাপানী পুতুলের মত পোষাক-পরা বেয়ারাদের সেলাম, বকের ঝাঁকের মাঝে দাঁড়কাকের মত গিয়ে ঢোকা, যখন ঘরশুদ্ধ লোক হেসে লুটোপুটি খায় তখন হাঁড়িমুখে বেকুবের মত বসে থাকা, বাড়ী এসে, 'লাভ্‌লি, স্প্লেনডিড্‌' বলে আসর জমান—এ সবের একটা সাট্‌ল্‌ আর্টিস্টিক এবং কালচারাল ভ্যালু আছে, যেটা আমরা পাইনে বাংলা ছবিতে। কি বলেন মিসেস ভৌমিক?

(আলো—৩০)

মিসেস ভৌমিক। নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই! তাছাড়া—ইংরেজি ছবির স্টারেরা মাইনে পায় কত? ওফ্‌! ভাবলেও গায়ে কাঁটা দেয়! তাহলে ঠিক রইল—সামনের শুক্রবারে—মেট্রো।

ড. নন্দী। বেশ, মজলিসের সবাইকেই বলা রইল।

ড. মুখার্জি। আজ যেন মজলিসটা তেমন জম্‌ছে না।

মিস্ চ্যাটার্জি। কি করে জমবে? চা নেই, সিগারেট নেই, কুৎসা নেই। মজলিস জমবে কিসে?

ড. নন্দী। বয়! শিগ্‌গির পঁয়ত্রিশ কাপ চা ক'রে নিয়ে আয় তো।

(আলো—২৫)

ড. বোস। ঠিক বলেছেন মিস চ্যাটার্জি। হিন্দুর সর্বস্ব তিনটি—ব্রহ্মা, বিষ্ণু আর মহেশ্বর; বৌদ্ধের তিনটি—বুদ্ধ, ধর্ম আর সংঘ, ক্রিশ্চিয়ানের তিনটি—পুত্র, পিতা আর পবিত্র ভূত; তেমনি মজলিসের সর্বস্ব তিনটি—চা, সিগারেট আর কুৎসা। (আলো—২০)

মিসেস ভৌমিক। হিয়ার, হিয়ার!

ড. মুখার্জি। আমি তা মানতে রাজি নই। অন্য মজলিসে যা ইচ্ছে হোক গে। আমাদের মজলিসে ঠিক ও প্রিন্‌সিপ্‌ল্ চল্‌বে না। অন্তত চলা উচিত নয়।

ড. নন্দী। আমারও তাই মত।

ড. দাস। কিন্তু একটা কথা আপনারা ভেবে দেখবেন। মজলিসের প্রাণ একটা ইনটেলেক্‌চুয়াল আনন্দ, একটা কালচারাল ডাইভারসন। স্থান, কাল, পাত্র বুঝে, সত্য, মিথ্যা, কল্পনা, অতিরঞ্জন মিশিয়ে বেশ রসাল স্টাইলে যদি পরনিন্দা না করা যায়, তাহলে আনন্দই বা কোথায় আর মজলিসের সার্থকতাই বা কি?

ড. নন্দী। কথাটা খানিকটা হয়তো ঠিক। কিন্তু আপনারা মনে রাখবেন, মজলিসের বিবেকরক্ষী হিসাবে আমার একটা দায়িত্ব আছে, কাজেই— (আলো—৩০)

ড. মুখার্জি। একটু সংযম দরকার।

মিসেস ভৌমিক। আচ্ছা, আপনাদের ভূতো-দার খবর কি?

মিস্ চ্যাটার্জি। এ মজলিসে ওরকম নাম অচল।

ড. রুদ্র। ও নামটা আমিই রেখেছি। যদি আপনাদের নেহাত অপছন্দ হয়, তবে বদলে রাখা যেতে পারে। কিংবা—

মিস্ চ্যাটার্জি। নাম যখন রাখাই হয়েছে, তখন আর বদলে কি হবে? কিন্তু ওরকম নাম আপনি রাখলেন কেন?

ড. রুদ্র। সে কথা আর তুলে কি হবে? অনেক সাধ করে নাম রেখেছিলাম, কিন্তু ওটা আর একা ভোগ করতে পারলুম না।

ড. নন্দী। মানে?

ড. রুদ্র। মানে, শেষে ওঁকে আমার স্ত্রীর সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিতে হ'ল।

মিসেস ভৌমিক। অর্থাৎ?

ড. রুদ্র। অর্থাৎ, লোকটা অত্যন্ত ইয়ে— (আলো—২০)

মিস্ চ্যাটার্জি। ইয়ে মানে?

ড. রুদ্র। মানে, কিছুই না। তবে কারো সম্বন্ধে কিছু একটা মনে ক'রে নিতে না পারলে, আমার ভাল লাগে না। সেইজন্যই তো বলছিলাম, ওঁকে আমার স্ত্রীর সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিয়েছি।

মিস্ চ্যাটার্জি। হেঁয়ালি রাখুন।

ড. রুদ্র। তবে শুনুন। আমি যখন প্রথম টার্ণার মরিসনে ঢুকি, তখন ওঁকে ভূতো-দা বলে ডাকতে আরম্ভ করি। পরে যখন টার্ণার মরিসনের বিরুদ্ধে আমার হয়ে মিথ্যা সাক্ষী দিতে অস্বীকার করলেন, তখন উনি হলেন আমার স্ত্রীর দাদা। আবার যখন শুনলুম তিনি টার্ণার মরিসনের মোটা শেয়ার কিনেছেন, তখন তিনি আবার আমার দাদা হলেন। যখন শুনলুম, তাঁর সব শেয়ার এক মাড়োয়ারিকে বিক্রী ক'রে

দিয়েছেন, তখন আবার আমার স্ত্রী ওঁকে দাদা বলতে আরম্ভ করলেন। এই রকম আর কি!

মিসেস ভৌমিক। বেশ আছেন তাহলে?

ড. রুদ্র। মন্দ কি! জীবনই তো এই! (আলো—১৫)

ড. নন্দী। আলো খুব ক'মে গেছে। আমাদের আলোচনার গতি একটু—

ড. মুখার্জি। উপরের দিকে তোলা দরকার হয়েছে।

মিস্ চ্যাটার্জি। আপনাদের স্নে টকের কি হ'ল—সেই—সেই ব্রহ্মত্বলাভের উপায়? (আলো—৪০)

ড. নন্দী। কই, ড. চৌধুরী তো এখনো এলেন না।

ড. দাস। তাহলে কি করা যায়! এমন একটা ইনটেলেক্চুয়াল সন্ধ্যা—শুধু কি বাজে কথা বলেই কাটবে?

মিস্ চ্যাটার্জি। কখ্খনো না।

ড. নন্দী। ড. চৌধুরী আজ আর আসবেন বলে তো মনে হচ্ছে না। যদি আর কেউ কিছু সম্বন্ধে—

কিছুক্ষণ মজলিসস্থ সকলে পরস্পরের প্রতি মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিলেন। বয় চা দিয়া গিয়াছে। অনেকেই এক এক চুমুক পান করিতেছেন। কেহ কেহ সিগারেট ধরাইয়াছেন। কেহ নিজের চেয়ারে বা সোফায় একটু নড়িয়া চড়িয়া বসিতেছেন। আড়াই মিনিট নীরব থাকিবার পর ড. নন্দীই প্রথম কথা বলিলেন।

ড. নন্দী। আচ্ছা, ড. চৌধুরী যখন এলেনই না, তখন ড. চক্রবর্তীই আজ কিছু বলুন।

মিস্ চ্যাটার্জি। আই সেকেণ্ড ইট!

ড. চক্রবর্তী। আমি ? আমি কি বলব ? বিশেষত এরকম একটা ইন্‌টেলেকচ্যুয়াল অডিয়েন্সের সামনে ?

মিস্ চ্যাটার্জি। 'না' বললে হবে না, ড. চক্রবর্তী। আপনাকেই আজ বলতে হবে কিছু।

ড. চ্যাটার্জি। নেহাতই আপনারা ছাড়বেন না, দেখছি।

ড. নন্দী। কি আর কর্‌বেন, ড. চক্রবর্তী। লোকে উপরোধে ঢেঁকিও গেলে।

ড. চক্রবর্তী কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। পরে চক্ষু অধ-নিমীলিত হইল। মজলিসস্থ সকলেই নীরব এবং উদ্‌গ্রীব। সমস্ত গৃহ কিঞ্চিৎ স্তব্ধ। (আলো—৬০)

ড. চক্রবর্তী। অহং। (আলো—৭০)

মজলিসস্থ সকলেই যেন একটু চমকিত হইলেন। মাত্র একটি শব্দ ? আর কিছু না ? মিসেস ভৌমিক ওষ্ঠ চাপিয়া হাসি নিবৃত্ত করিলেন। মিস্ চ্যাটার্জি সাড়ীর খুঁট মুখে পুরিলেন। ড. মুখার্জি সোৎসুক আগ্রহে উৎকর্ণ হইলেন। ড. নন্দী আলোর স্থইচের প্রতি অধিকতর মনোনিবেশ করিলেন। আড়াই মিনিট নীরব থাকিবার পর ড. চক্রবর্তী পুনরায় কথা বলিলেন।

ড. চক্রবর্তী। অহং, অর্থাৎ আমি।

আবার সব নীরব। ঘরের বাতাসও যেন ক্রমশ জমিয়া আসিতেছে। একটা স্থপ্রা-মেণ্টাল ভাব-স্রোত যেন সকলকে পাইয়া বসিতেছে। ড. চক্রবর্তী, ধীরে—অতি ধীরে পুনরায় কথা আরম্ভ করিলেন।

ড. চক্রবর্তী। আমিই জগতের কেন্দ্র। জগতের যত কিছু কাজ, যত কিছু চিন্তা, যত কিছু কল্পনা, সকলেরই কেন্দ্র 'আমি'। 'আমি' যেন একটা ভর্টেক্স। চারিদিকে যাহা কিছু আছে, সবই যেন ঘুরিয়া

ঘুরিয়া আসাতেই আসিয়া বিলুপ্ত হইতেছে। 'আমি' যেন একটা রেডিয়েটর। চারিদিকের যত কিছু শক্তি, যত কিছু আলোক, যত কিছু তেজ, সবই আমা হইতে রেডিয়েটেড হইতেছে। 'আমি' যেন একটা এঞ্জিন। চারিদিকের যত কিছু কাজ, যত কিছু অকাজ, যত কিছু ভাঙা, যত কিছু গড়া, সবেরই মূল শক্তি এই আমি। ব্যক্তির, সমাজের, বিশ্বের, সমস্ত সত্তার মূল আমি। অহং।

(আলো—৮০)

সোঽহং। আমিই সেই। যাহাকে লোকে বলে ভগবান্, সে এই—'আমি'। যাহাকে জ্ঞানীরা বলেন, ব্রহ্ম, সে এই আমি। বৈষ্ণবের নিমাই আমি, শাক্তের আদ্যাশক্তি আমি, বৌদ্ধের শূন্য আমি, ক্রিশ্চিয়ানের যীশু আমি। অখিল ব্রহ্মাণ্ডের মূলাধার আমি।

(আলো—৯০)

মিস্ চ্যাটার্জি একটু ফিস ফিস করিয়া মিসেস ভৌমিকের কাণে কাণে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিছু বুঝচেন? মিসেস ভৌমিক অতি সন্তর্পণে উত্তর দিলেন, আমার ঘুম পাচ্ছে।

ড. চক্রবর্তী বলিয়া যাইতে লাগিলেন—

অহং জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান। আমাকে জানাই সব জানা। শিক্ষা, দীক্ষা, ভ্রমণ, পূজা, অর্চনা, যাগযজ্ঞ, দান ধ্যান, যাহা কিছু মানুষে করে, তার একমাত্র লক্ষ্য এই অহংজ্ঞান। অহংজ্ঞান সম্পূর্ণ হলে আর কিছুরই প্রয়োজন থাকে না। আহার, বিহার, প্রভৃতি শারীরিক প্রয়োজন, পাঠ, চিন্তা, প্রভৃতি মানসিক প্রয়োজন, পূজা, অর্চনা প্রভৃতি আধ্যাত্মিক প্রয়োজন—সব শেষ হয়ে যায়। সব শেষ হয়ে গিয়ে অবশিষ্ট থাকে শুধু অহং। অহংই ব্রহ্ম। (আলো—১০০)

ড. দাস। অতি নিম্নস্বরে ড. নন্দীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিছু

বুঝ্‌চেন ? ড. নন্দী বলিলেন, না বুঝলেও বোঝা উচিত। ড. চক্রবর্তী বলিয়া যাইতে লাগিলেন—

এই অহংজ্ঞানকেই পরাবিদ্যা বলে। এই বিদ্যার্জনের পর আর কিছু শিখবার থাকে না। সব বলা, সব শোনা, সব করা, সব ভাবার শেষ এইখানে। সব লোভ, সব মোহ, সব আশা, সব আকাঙ্ক্ষা, সব চিন্তা, সব কল্পনা বিলীন হয়ে যায় এই অহং-এ। সর্বং খল্বিদম্ অহং।

ঘরে মজলিসি আলো ব্যতীত আরো একটি আলো আছে। তাহার শক্তি ষাট। ড. নন্দী অতি সন্তর্পণে সেই আলোটি জ্বালিয়া দিলেন এবং মজলিসি আলোটিকে কমাইয়া পঞ্চাশে আনিলেন।

(আলো—১১০)

ড. চক্রবর্তী বলিতেছেন—

কিন্তু এই অহংজ্ঞান অহমেই আবদ্ধ রাখতে হবে। অহংজ্ঞান লাভ করে তা প্রচার করতে নেই। অহমের প্রচার মৃত্যুর সমান। অহমের বহিঃপ্রকাশ নিষিদ্ধ। অহম্‌কে অহমেই তৃপ্ত থাকতে হবে।

(আলো—১২০)

আমাদের কথা, কাজ, চিন্তা অহংমুখী হোক—যেন বহির্মুখী না হয়। কখনো যেন বহিঃপ্রকাশের জন্য আমরা ব্যাকুল না হই! আমাদের সমগ্র শক্তি, সমগ্র উৎসাহ, সমস্ত প্রেরণা অন্তর্মুখী হোক।

ড. চক্রবর্তীর শান্ত গম্ভীর বক্তৃতা এমন করিয়াই চলিতে লাগিল। সমস্ত ঘর একেবারে নিস্তব্ধ, কাহারও নিঃশ্বাস বুঝি পড়িতেছে না। একটা আলট্রা-ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল আবহাওয়ায় ঘরটা যেন থমথম করিতেছে। আলো বাড়িতে বাড়িতে ১৬০-এ পৌঁছিয়াছে। ড. চক্রবর্তী এবার নীরব হইলেন।

কিছুক্ষণের নীরবতার পর মজলিসস্থ সকলেই এক এক জন করিয়া

অতি ধীরে অতি নিঃশব্দে গৃহ ত্যাগ করিলেন। ড. নন্দী আলো ক্রমশ কমাইয়া একশততে আনিয়া রাখিলেন। পরে তিনিও ড. চক্রবর্তীকে ধ্যানস্তিমিত অবস্থায় রাখিয়া একবার বাড়ির ভিতর ঘুরিয়া আসিতে গেলেন।

ড. চক্রবর্তী ক্রমশ যেন চেতনা ফিরিয়া পাইলেন। এদিক ওদিক চাহিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। শুধু ঘরের দুই কোণ হইতে দুইজন—একজন কোট-প্যাণ্ট পরিহিত এবং আর এক জন খদ্দর-পরিহিত—নীরবে এবং সসম্ভ্রমে নিকটে আসিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন।

ড. চক্রবর্তী জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা?

কোট-প্যাণ্ট। আমি স্টেট্‌স্‌ম্যান।

খদ্দর। আমি আনন্দবাজার।

ড. চক্রবর্তী। আপনারা কি চান?

কোট-প্যাণ্ট। আজ্ঞে, আপনার কাছে বলতে লজ্জা হচ্ছে, আপনার টকের একটা অ্যাবস্‌ট্র্যাক্ট—মানে—অনেক চেষ্টা ক'রেও আমরা সর্টহ্যাণ্ডে ঠিক ধরতে পারিনি। শেষে কি লিখ্‌তে কি লিখে ফেলব!

খদ্দর। আজ্ঞে, বাংলায় যদি একটু লিখে দেন—

ড. চক্রবর্তী ডান পকেট হইতে একখানি ইংরাজিতে লেখা এবং বাম পকেট হইতে একখানি বাংলায় লেখা কাগজ বাহির করিয়া উঁহাদের হাতে দিয়া বলিলেন, এই নিন।

কোট-প্যাণ্ট এবং খদ্দর পরস্পর মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিলেন। পরে কোট-প্যাণ্ট বলিলেন, আজ্ঞে, আজ তো আপনার বক্তৃতা দেবার কথা ছিল না। ড. চৌধুরীর একটা টক দেবার কথা ছিল।

ড. চক্রবর্তী। ড. চৌধুরী আজ আস্‌বেন না, আমি জানতুম, আর তিনি না এলে আমাকেই এঁরা বলতে বলবেন, তাও জানতুম।

কোট-প্যাণ্ট। ও!

ড. চক্রবর্তী। দেখুন, আপনারা চেষ্টা করবেন যেন, কালই ওগুলো বেরোয়। আর দেখুন, হেডিংটা একটু বড় অক্ষরেই ছাপবেন।—হ্যাঁ, আর আমার ওই ডিগ্রীগুলো—

কোট-প্যাণ্ট। আচ্ছা, বিশেষ চেষ্টা ক'রব।

কোট-প্যাণ্ট এবং খদ্দর উভয়েই ড. চক্রবর্তীকে নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। ড. নন্দী বাড়ীর ভিতর হইতে ফিরিয়া আসিয়া ড. চক্রবর্তীকে বিদায় দিলেন। মজলিস্ শেষ হইল।

জুন, ১৯৪১